খেয়াল-খুশি-অসম্ভব

সম্পাদক

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৫
অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
রতিকান্ত ঘোষ
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
মণীন্দ্র মিত্র

পরিকল্পনাটা তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমানমানবেন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুধু পরিকল্পনা নয়, কয়েকটি গল্পের নির্বাচনও। কথাটা তখনই আমাদের মনে লাগে এবং আজগুবি গল্পের একটা সঙ্কলন-গ্রন্থের জন্য তখন থেকেই উঠে-পড়ে লেগে যাই। দ্রুত কাজ এগোতে থাকে এবং অবিলম্বেই ছাপার কাজ শুরু হয়।

মূলতঃ আজগুবি বা খেয়াল-রসের গল্প হলেও এর সমস্ত গল্পই যে ঠিক আজগুবি তা নয়; এমন কয়েকটি গল্পও এতে স্থান পেলো, হাসিখুশির হাটে যাদের ঔজ্জ্বল্য কোনোদিন ম্লান হবার সম্ভাবনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের জন্য বিশ্বভারতী, প্রমথ চৌধুরির গল্পের জন্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের জন্য মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির গল্পের জন্য সুবিমল রায়চৌধুরি, সুকুমার রায়ের গল্পের জন্য সত্যজিৎ রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্পের জন্য মনোরমা দেবী, আর লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রলাল বসু, রবীন্দ্রলাল রায়, বিমল দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, কার্তিক মজুমদার প্রভৃতি—এঁরা আমাদের গল্পগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

প্রকাশক

কুম্ভীর বিভ্রাট

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা কহিলেন, 'শুনিয়াছি যে সুন্দরবনে নদীনালায় অনেক কুমির আছে। তোমার আবাদে কুমির কিরূপ ?'

ডমরুধর বললেন, 'কুমির! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমিরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মতো নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে-পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গোরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ-সব কুমিরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমিরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুম্ভীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পিঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে এ কুমির এক গালে খাইতে পারে। পর্বতপ্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে গজ-কচ্ছপকে এ কুমির নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়ো, ইহা উদর এই দালানটির মতো। অন্যান্য কুমির জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে, কিন্তু এ কুমিরটা আস্ত গোরু আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গোরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ লোক অস্থির হইয়া পড়িল প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল। ভাসিয়া ... লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে

ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ-পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

'এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে-একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জানো যে কুমিরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক পায় না। কুমির যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল—চিরকাল আমি কপালে পুরুষ; যদি এই কুমিরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া ঐ গহনাগুলি বাহির করিব, অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

'এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড়ো একটি জাহাজের নোঙর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে-কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমির আর একটি মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁওতালনী একঝুড়ি বেগুন মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে আর কুমির তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

'আবাদে আসিয়া নোঙরটিকে আমি বঁড়শি করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসুতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হা[illegible]য় হই[illegible]

নোঙরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্য দিক এক গাছে পাক দিয়া রাখিলাম, তাহার পর পঞ্চাশজন সবল লোককে নিকটে লুক্কায়িত রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

'বঁড়শিতে মহিষের বাছুর বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ-গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ল্যাজের ঝাপটে পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল; তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে, নোঙরবিদ্ধ বাছুরকে কুমির গিলিয়াছে, বঁড়শির ন্যায় নোঙর কুমিরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশজন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমিরের বলে এই পঞ্চাশজন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমিরকে বঁড়শিতে গাঁথিয়াছি, এই কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে সেই কুমির সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখনও আমাদের ভয় হইল যে, তাহার বিপুল বলে নোঙর বা ভাঙিয়া যায়, কখনও ভয় হইল যে, সে জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়। কখনও ভয় হইল, গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া বা পড়ে। নিশ্চয় একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটিত, যদি-না সাঁওতালগণ কুমিরের মস্তকে তীর বর্ষণ করিত, যদি-না নিকটস্থ আবাদের দুইটি লোক বন্দুক আনিয়া কুমিরের মাথায় গুলি মারিত। তীর ও গুলি খাইয়া কুমির মাঝে-মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোকে তীর ও গুলি

বর্ষণ করিতে লাগিল। কুমিরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমিরের সহিত আমাদের যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতিকষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

'বড়ো-বড়ো ছোরা, বড়ো-বড়ো কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমিরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙিয়া গেল। অবশেষে করাতি আনাইয়া করাতের দ্বারা উহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির!'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিলে?'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিলে?'

অন্যান্য শ্রোতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিলে?'

ডমরুধর বলিলেন, 'বলব কী ভাই আর দুঃখের কথা, কুমিরের পেটের ভিতর দেখি না যে, সেই সাঁওতালনী, চারিদিন পূর্বে কুমির যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সে পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছে।'

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুমিরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল?'

ডমরুধর বলিলেন, 'হাঁ ভাই। কুমিরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমিরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা?'

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন, 'তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না।

সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম, "এই! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমির ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।" কেঁউ-মেউ করিয়া সে আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জ্ঞাতি-ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠিসোঁটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ লইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে-মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।'

লম্বোদর বলিলেন, 'এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বলো দেখি?'

ডমরুধর বলিলেন, 'এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কুমিরের গল্প যে সত্য তাহার কোনো প্রমাণ আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, 'প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমিরের দাঁত আমি পরিয়াছি।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে-কুমির যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোটো কেন? ঠিক অন্য কুমিরের দাঁতের মতো কেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, 'অনেক মানুষ খাইয়া সে-কুমিরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।'

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকালে ব'সে চা খাচ্চি এমন সময় 'সে' এসে উপস্থিত।

জিগেস করলুম, 'কিছু বলবার আছে?'

ও বললে, 'আছে।'

'চট ক'রে ব'লে ফেলো, আমাকে এখনি বেরোতে হবে।'

'কোথায়?'

'লাটসাহেবের বাড়ি।'

'লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি?'

'না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।'

'ভালো কিসের?'

'জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে-কথা তুমি জানো।'

'জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছো।'

'অসম্ভব গল্পেরই যে ফরমাশ।'

'হোক না অসম্ভব, তারো-তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।'

'তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও।'

'আচ্ছা বলি শোনো:

'স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে-একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না,

উল্টো হ'লো, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগলো। সামনে পেলেন অক্টর্লনি মন্যুমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে-চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে।

'বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট হলে ব'সে জুতো শেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এলো। বললে—"আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হ'য়ে এত বড়ো জিনিশটাকে এঁটো ক'রে দিলেন!" "তোবা-তোবা" ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞা সাহেব দৌড়ে গেল স্টেটসম্যান আপিশে খবর দিতে।

'স্মৃতিরত্ন মশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হ'লো মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, "পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে।"

'পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, "কোমা ভূ পোর্তে ভূ সি ভূ প্লে।"

'পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাবো। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি।"

'পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু-টান টেনে বললে, "তাহ'লে এক্ষুণি খুলুন ওয়েবস্টার ডিক্‌শানারি, দেখুন বিধান কী।"

'স্মৃতিরত্ন বললেন, "তাহ'লে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।"

'পাঁড়ে বললে,"কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি।"

'স্মৃতিরত্ন বললেন, "তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পর্শুদিন। ছুটতে হ'লো উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে শাবল আনিয়ে সাফ ক'রে দিলেন।"

'পাঁড়েজি বললে, "তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন?"

'পণ্ডিতমশায় বললেন, "দাঁতন করতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁড়েজি বললে, "ওঃ তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তাহ'লে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হ'তো।" '

এই পর্যন্ত ব'লে গুড়গুড়িটা কাছে নিয়ে দু-টান টেনে সে বললে, 'দেখো দাদা, এই রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যে-রকম জানি সেটাকে অন্যরকম ক'রে দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বলো লাট সাহেব কলুর ব্যবসা ধ'রে বাগবাজারে শুঁটকি মাছের দোকান খুলেছেন তবে এমন শস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।'

'চটেছো ব'লে বোধ হচ্ছে।'

'কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছেতাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ ব'লেই দিদি হাঁ ক'রে সব শুনেছিল। কিন্তু অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।'

'সেটা ছিল না বুঝি?'

'না, ছিল না। চুপ ক'রে থাকতুম যদি আমাকে সুদ্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছো, শর্ষে-বাটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধ'রে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তাহ'লে বলতুম আমি ওটা হ'লো স্থূল। ওরকম লেখা সহজ।'

'আচ্ছা, তুমি হ'লে কী-রকম লিখতে?'

'বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়। কম ব'লেই সুবিধে। আমি হ'লে বলতুম, তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে, দেখা-বিনতি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল, শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামকুনি

দেবি, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিল্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানিনে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হ'য়ে পাখা ঝাপটায় তিনঘণ্টা ধ'রে। এ তো গেল তরকারি। আর জালা-জালা-ভর্তি ছিল কাঙ্ চুটোর সাঙ্চানি। সে-দেশের পাকা-পাকা আঁকশুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকৃটিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলি দ'লে দিল, তারপরে ওদের দেশের সবচেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে-গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্ভুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে-চেটে কতকটা নরম ক'রে আনলে, তারপরে, তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগলো। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে-দলে। খেতে-খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান ক'রে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল ক'রে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যতো দাঁত তার ততো নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো-বড়ো মকদ্দমা হ'য়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয়না, একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেট্কু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেশারতের দাবি ক'রে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভি-কৌন্সিল পর্যন্ত।'

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, 'থামো, থামো, কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে-কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী?'

'ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানিনে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু এতেও যে আছে উঁচুদরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পারো যদি তাহ'লেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাৎ বাজারে-চলতি ছেলে-ভোলাবার শস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাকো তাহ'লে তোমার অপযশ হবে এই আমি ব'লে রাখলুম।'

আমি বললেম, 'আচ্ছা এমন ক'রে গল্প বলবো, যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।'

'ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায় ?'

'বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই "তুমি যাও" অনুরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হ'লো।'

'বুঝেছি, আচ্ছা তবে চললুম।'

পুপে এসে জিগেস করলে, 'দাদামশায় তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমন্তন্নে ? কী হ'লো !

'সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্‌কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।'

'তারপরে ?'

'তারপরে নিজে খেলুম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, 'দাদাবাবু, 'এ যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।"' '

'সে কিছু খেল না ?'

'জো কী।'

'সে এল না ?'

'সাধ্য কী তার।'

'তবে সে আছে কোথায় ?'

'কোথাও না।'

'ঘরে ?'

'না।'

'দেশে ?'

'না।'

'বিলেতে ?'

'না।'

'তুমি যে বলেছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হ'য়ে আছে ? গেল নাকি ?'

'দরকার হ'লো না।'

'তা'হলে কী হ'লো আমাকে বলছো না কেন ?'

'ভয় পাবে কিংবা দুঃখ পাবে তাই বলি নে।'

'তা হোক বলতে হবে।'

'আচ্ছা তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার প'ড়ে নেবার কথা ছিল "বিদগ্ধমুখমণ্ডন"। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে প'ড়ে, হাতে উঠে এসেছে "পাঁচু পাকড়াশির পিসশাশুড়ি"। পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্ব'লে উঠে আমাদের কিনি বামনির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে, সাতদিন সাতরাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদে পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মুনলাইট স্নো, তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবেনা গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙে মিলবে না। শুনেই আমার কাছ থেকে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে।

'এমন সময় ঘরে একটা কি শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার

তৈরি চটিজুতো হুস-হুস ক'রে টানতে-টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় ক'রে উঠলেম, উস্কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা কিছু এসেছে দেখা গেল, কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, "কে হে তুমি, পুলিশ ডাকবো নাকি?"

'অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, "কী দাদা চিনতে পারছো না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল!"

'আমি বললুম, "বাজে কথা বলছো, এ কী চেহারা তোমার!"

'সে বললে, "চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।"

' "হারিয়ে ফেলেছো! মানে কী হ'লো?"

' "মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলিনিপাড়ার ঘাটে ব'সে ঝামা দিয়ে ক'ষে মুখ মাজছিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে-ঢুলতে ঝুপ ক'রে পড়লুম জলে। তারপর কী হ'লো জানিনে। উপরে এসেছি, কি নিচে কি কোথায় আছি জানি নে, স্পষ্ট দেখা গেল. আমি নেই।"

' "নেই!"

' "তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—"

' "আরে আরে গা ছুঁতে হবে না, ব'লে যাও।"

' "চুলকনি ছিল গায়ে, চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হ'লো। হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউ-হাউটা বিনামূল্যে পেয়েছিলুম, সে গেল কোথায়! যত চ্যাঁচাই চ্যাঁচানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হ'লো মাথা ঠুকি বটগাছটাতে, মাথাটার টিকি খুঁজে পাইনে কোথাও। সবচেয়ে দুঃখ, বারোটা বাজলো, খিদে কই খিদে কই ব'লে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।"

' "কী বকছো তুমি, একটু থামো।"

' "ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী, অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামবো না, আমি থামবো না, কিছুতেই থামবো না, যতক্ষণ পারি থামবো না।"

'এই ব'লে ধুপধাপ ধুপধাপ ক'রে লাফাতে লাগলো, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

' "করছো কী তুমি!"

' "দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছিনে। মারধোর যদি করো সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইলো, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী! কই মাছের যদি এই দশা হ'তো তা'হলে বামুনঠাকুরের হাতে-পায়ে ধরতো তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ-ওপিঠ ওল্টাতে-পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইঁট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোওয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয় উঃ—দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম।"—ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

'আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "যাও-যাও, স'রে যাও।"

'ও বললে, "কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে-গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছিনে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি আমাদের পাতু খুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হ'লো তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হ'য়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক পোকার মতো মিটমিট করছে। বুঝলুম হয়েছে সুযোগ, নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগরা জুতোর ভিতরে যেমন ক'রে পা-টা গুঁজতে হয়। সে

হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো, "কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।" তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে, বললুম, "তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।"

'সে গোঁ-গোঁ করতে-করতে বললে, "অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।" দিলুম ঠেলা, হুস ক'রে গেল বেরিয়ে।

'এদিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, "বলি ও পোড়ারমুখো!"

'কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, "বলো, বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে. এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাবো এমন আশাই ছিলো না!"

'বুড়ি ভাবলো ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হ'লো, প'ড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠলো শিউরে। ইচ্ছে ক'রলো র‍্যাঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

'গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারাহারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়!

'ঠিক এই সময়ে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব কটা নাড়ি চোঁ-চোঁ ক'রে উঠেছে একসঙ্গে চোখে দেখতে পাইনে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ কী আনন্দ!

'মনে পড়লো তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্নতে কী যে আরাম সে আর কী বলবো। ফুর্তিতে একেবারে গলদঘর্ম। এক-এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছিনে, থামছিনে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয়নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে ব'সে আছো কেদারায়, বুঝতেই পারো না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায় আছি বটে, খুব ক'ষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

'আমি বললুম, "সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।"

' "করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে-কথা ভুললে চলবে না।"

' "রাত এখন তিনটে সে-কথা তুমিও ভুললে চলবে না।"

' "তাহ'লে চললুম পুপুদিদির কাছে।"

' "খবরদার!"

' "দাদা, ভয় দেখাচ্ছো মিছে, মরার বাড়া গাল নেই, চললুম।"

' "কিছুতেই না।"

'সে বললে, "যাবোই!"

'আমি বললুম, "কেমন যাও দেখবো।"

'সে বলতে লাগলো, "যাবোই, যাবোই!"

'আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে-নাচতে বললে, "যাবোই, যাবোই, যাবোই!" শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগলো, "যাবোই, যাবোই, যাবোই!"

'আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানাটানিতে গা থেকে ঢিলে মোজার মতো দেহটা সরসর ক'রে খ'সে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো।

'সর্বনাশ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে! চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, "আরে আরে, শোনো, শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা-টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে!"

'কেউ কোথাও নেই। ভাবছি "আনন্দবাজারে" বিজ্ঞাপন দেবো।'

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, 'সত্যি কি দাদামশায়!'

আমি বললুম, 'সত্যির চেয়ে অনেক বেশি—গল্প।'

সাতমার পালোয়ান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত ; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসি গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইএর বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া, সুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়োই রাগি ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইএর স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখো যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিড়ে আর ঝোলাগুড়, এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিড়ে খায়, আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি না।

কানাইএর ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্চো? আচ্ছা রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলাকে এমনি এক ঘা লাগাইল, যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গণিয়া দেখিল যে সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে

লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বড়োই বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'ছাখ্, হিসেব ক'রে কথা কোস্! এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পিড়াপিড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব ক'রে কথা কোস্; এক ঘায়ে সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে কানাই একদিন একথান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায় দিয়া, কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, নাগরা জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকবো না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি!'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোনো উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে, এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান'!

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই একথান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল; মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গোরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া, দু'দিনে দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব ক'টাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজা মহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—'দেশ আর থাকে না!'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে-কানে বলিল, 'রাজা মহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কী করতে? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না?'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাইতো--ডাকো পালোয়ানকে!'

'রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটবো।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা, মহারাজ, এখনই যাচ্ছি!'

~

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না; সঙ্গে-সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন করি কী? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে; না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে; আমি আর এদেশে থাকবো না।'

সেদিন সন্ধ্যার পরে কানাই তার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর একহাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতা। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া

যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভালো। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র-শীঘ্র যাওয়া যাইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি,—এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনি একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপমুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনিটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে বাঘে ধ'রে নেবে!' নাতনি বলিল, 'আমি বাঘকে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে টঁ্যাপায় নেবে!'

বাস্তবিক "টঁ্যাপা" বলিতে একটা কিছু নাই; বুড়ি তাহার নাতনিকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে টঁ্যাপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল। সে মনে-মনে বলিল—

'বাস্ রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু টঁ্যাপাকে ভয় করবে! সেটা না-জানি তবে কেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার! যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তাহ'লেই তো মুশকিল দেখছি!'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে; আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে-মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই তো একটা ঘোড়া ব'সে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভালো করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তার মাথায়

ঢুকে নাই। সে বেচারি নেহাৎ ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে! মাটি করেছে! আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুই, তারপর শেষ রাত্রে ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুট দেবো।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কী করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, ওর কথা-মতনই চলতে হবে!'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাবো!'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে-ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে, বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে-কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকাল বেলায় সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজা মশাই, দেখুন সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধ'রে এনে তার ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজা মহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, সত্য-সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজা মহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মারোনি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি; ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ-বিদেশে রাষ্ট হইয়া গেল। রাজা মহাশয় যারপর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইএর আর এক নতুন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়োই ভয়ানক লোক; তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজা মহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই! তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার!'

কানাই বলিল, 'রাজামশায়, কোনো চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি। আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভালো ঘোড়াটি কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর মতন করিল। মনে-মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া, কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতেই রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন তাহার পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোনো কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতা-পাতা, গাছ-পালা, খড়ের গাদা, যাহা কিছু পাইয়াছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা

করিয়াছে. কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছ-পালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যেরা শুনিতে পাইয়াছে যে, এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে ;—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে। একথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না! বাপ্‌রে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে!'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি, আর সেইসব গাছ-পালা আর খড়ের গাদাসুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল। দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যেরা তাহা একবার দেখিয়া আর দু'বার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চ্যাঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে! এবারে গাছ-পাথর ছুঁড়ে মারবে,'—অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার-হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে-মনে ভাবিল, 'এ তো মন্দ নয়! পালাতে চলেছিলুম, মাঝখানে থেকে কেমন ক'রে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন তো সাতমার পালোয়ানেরই জয়-জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

ফার্স্ট ক্লাশ ভূত

প্রমথ চৌধুরী

আমরা তখন সবে কলকাতা এসেছি, ইশকুলে পড়তে। কলকাতার ইশকুল যে মফস্বলের চাইতে ভালো, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইশকুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। সব ইশকুলই তেড়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই শিক্ষিত হয় না; আর যদি কেউ হয়, তা নিজ গুণে—শিক্ষা বা শিক্ষকের গুণে নয়। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসবার মাস-তিনেক পরে হঠাৎ সারদা-দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা-দাদা কী হিশেবে আমাদের দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম-সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মতো দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা-না-একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কী, তাও কেউ জানতো না; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হ'য়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, আর সব জায়গাতেই আদর যত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর কথায়-বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হ'ন, মামা হ'ন, দূর সম্পর্কের শালা হ'ন, ভগ্নিপতি হ'ন—সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারো কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একজন বিধবা

আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হ'লে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক ব'লে তাঁর মানও ছিল।

সারদা-দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশি হলুম, যদিও ইতিপূর্বে তাঁকে কখনো দেখিনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাদের মনে হ'লো, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে বাঁচবো। কলকাতায় আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোনো বন্ধুবান্ধবও ছিল না, যার সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে সময় কাটানো যায়। আর ইশকুলে সহপাঠিদের সঙ্গে গল্প ক'রেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাতাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতোই ছিল—নেহাৎ জ'লো।

সারদা-দাদা রোজ সন্ধেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, সারদা যা বলে, তার ষোলোআনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাইনি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা-দাদা বেশির ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা মা'র কাছে ফাঁস করিনি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলতো, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় পেতেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ ক'রে দিলেন। পাছে মা সারদা-দাদাকে বিদায় ক'রে দেন, এই ভয়ে মা'র কাছে এ গল্প-সাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তাছাড়া কলকাতা শহরে তো ভূতের ভয় নেই! রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ি, জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চ্যাঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাক, হল্লা দেদার

আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদা-দাদা শুধু সেইসব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—'আপনি তো শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব-ভূত দেখেন নি?'

সারদা-দাদা উত্তর করলেন—'দেখবো কোত্থেকে?—সাহেব তো এদেশে আর মরে না! না মরলে তারা ভূত হবে কী ক'রে? ছাখো, ট্রেনে এত বড়ো-বড়ো কলিশান হয়, যাতে হাজার-হাজার দেশি লোক মরে; কিন্তু তাতে কোনো সাহেব মরেছে, এমন কথা কি কখনো শুনেছো?'

—'তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে?'

—'সব ফিরিঙ্গি। তবে দু-চারজন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা ম'রে ভূত হয়, তাদের আমরা দেখা পাইনে।'

—'কেন?'

—'এদেশে তারা গাছেও থাকেনা, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফাস্ট ক্লাশ গাড়িতে চ'ড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম। আর তার হাতে যে সাজা-শাস্তি পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হ'লে কান্না পায়।'

—'আমরা সেই সাহেব-ভূতের গল্প শুনতে চাই।'

সারদা-দাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

'আচ্ছা বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে ব'লো না।'

—'কেন?'

'কী জানি, আবার যদি মানহানির মামলায় প'ড়ে যাই! মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই।' এর পর সারদা-দাদা বললেন:—

'আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে। তাই একটা

খালি ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে উঠে পড়লুম এই মনে ক'রে যে, পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাশে ঢুকব। গাড়ি তো ছাড়লো, অমনি বাথরুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগলির মতো। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, আর সে বিলিতি মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে, "কালা আদমি নিচু যাও!" আমার তখন ভয়ে নাড়ি ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে-কাঁপতে বললুম, "হুজুর আভি কিস্তরে নিচু যায়েগা? দুস্‌রা স্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে!" তিনি বললেন—"ও নেহি হো-সক্‌তা। তোমারা কাপড়া বহুত ময়লা, আর তোমারা দেহ্‌ মে বহুত বদ্‌বু। গোসলখানামে যাকে তোমারা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আর হুঁই বৈঠ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোছলখানা সে নিক্‌লিয়ো। হাম যো বোল্‌তা আভি করো, জান্‌তা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায়?" আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম। অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হ'য়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে আমার কাপড়চোপড় উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হ'য়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় ছুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে-মধ্যে চিৎকার ক'রে আমার প্রতি শুয়োর গাধা উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

'প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি-হি ক'রে কাঁপছি, সর্বাঙ্গে একটুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড়ো সাহেব মদ খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন। মাঝপথে গাড়ি হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামলো। ক্লিক্‌ ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো—ছিটকিনি খোলবার আওয়াজ। তারপর গাড়ি ফের চলতে লাগলো। পাশের ঘরে টুঁ শব্দ নেই, তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা করলুম। ও সর্বনাশ! বড়ো সাহেব স্নানের

ঘরের দুয়োর ছিটকিনি টেনে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধকূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ি বর্ধমানে এসে পৌঁছলো। আর আমি বাথরুমের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা-থাকে কপালে ভেবে 'কুলি' 'কুলি' ব'লে চিৎকার করতে লাগলুম। তারপর একজন কুলি এসে ছিটকিনি খুলে আলো জ্বেলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল। শেষটা স্টেশন-মাস্টার বাবু এসে—"ভূত নেহি হ্যায়, চোর হ্যায়" বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে আধমরা ক'রে প্ল্যাটফরমের উপর টেনে নিয়ে গেল।

'স্টেশন-বাবু বললেন, "শিগগির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে। যদি কোনো মেমসাহেব হঠাৎ এসে উলঙ্গ মূর্তি দেখে মূর্ছা যান, তাহলে আমার চাকরি যাবে!" একজন আমাকে একটি ছেঁড়া কাপড় দিলে, সেই কাপড় প'রে আমি স্টেশন-বাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন যে রেলের বড়ো সাহেব এখন শিমলায়; তা ছাড়া এ-ট্রেনে কোনো সাহেব আসেওনি, কোথাও নেমেও যায়নি। এখন বুঝলুম যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়—সাহেবের ভূত। তারপর স্টেশন-বাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম একপত্তন মার হ'লো, তারপর দারোগাবাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকেও বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে প'ড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

'তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত। তিনি গাড়িতে ভূতের উপদ্রব-কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন, কারণ, তিনি ছিলেন ঘোর 'থিয়োজফিস্ট'। কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না। ভগবান ও ভূত

এ দু'য়ের অস্তিত্ব বে-আইনি। অগত্যা তিনি আমাকে একমাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তারপর আমাকে সতর্ক ক'রে দিলেন এই ব'লে যে—"গাঁজা খাও তো খেয়ো। কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনো বিনে টিকিটে ট্রেনে চ'ড়ো না, বিশেষত তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্টক্লাশে তো নয়ই।"

'আমি বললুম, "হুজুর, গাঁজা আমি খাইনে।" তিনি বলিলেন, "গাঁজাখোর ব'লেই তো তোমাকে লঘুদণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ করতুম।"'

এখন তোমরা ফার্স্টক্লাশ ভূতের কথা তো শুনলে? এদের তুলনায় পাড়াগেঁয়ে ভূতরা ঢের বেশি সভ্য।

হেতি হোতির বৃত্তান্ত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রজাপতিঃ পুরাস্পষ্টা অপঃ সলিলসম্ভবঃ
তাং সাং গোপায়নে সন্তানস্বজৎ পদ্মসম্ভবঃ।

স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ঘুম ভেঙে উঠেই এক কোশা জল, এক খামচা মাটি নিয়ে অসৃজৎ করলেন—

জল ও জাঙাল,
ভূচর খেচরাদি পাখ-পাখাল ;
আর, তাদের চরাতে—হেতি হোতি নামে দুটি রাখাল।

তাদের দেখতে হ'লো কেমন ?

হেতি হোতি গোল-গাল,
একটি অতি কালো।
একটি অতি লাল।
হাত পা সরু সরু যেন পদ্মনাল।
ইঁচড়ে পাকা কাঁঠাল আর মাকাল যেমন,
দামাল দুটি ছাবাল তেমন।

জন্মাবামাত্র হেতির লাগলো খিদে, হোতির জ্ব'ললো পেট। দুটোতে আকাশ পাতাল মুখব্যাদান ক'রে প্রজাপতিকেই বুঝিবা গিলে ফেলায় এমনি ভাব জানায়, আর কাঁদে।

তাদের কান্না শুনে পুরাকালের জীবজন্তু সব কিম্ভূতকিমাকার, তারাও ধরে উৎকট রব। ভয় জানায়, ক্ষুধা জানায়, পেট চাপড়ায়, আর হাঁ করে বিকট। প্রজাপতিকে ডেকে বলে—

ক্ষুৎখাম-রক্ষাম ভক্ষাম-কখাম কিং কুর্ম,

হুম! প্রজাপতি-সম্প্রজায়তি কিংখাম-কংখাম?

বৃহদাকার কদাকার সব পুরাকালের জীবজন্তু। এক একটা হাত-পা-ওয়ালা বগযন্ত্র; গ্রামোফোনের চোঙা-পরানো বড়ো-বড়ো ঢাকাই জালা থেকে কারুর গলা বেরুচ্ছে চেঁ চেঁ—এঁ এঁ আওয়াজে। প্রজাপতির কর্ণ বধির। তিনি যত বলেন—'থাম, থাম,' ওরা মোটা মোটা থামের মতো হাত-পা নেড়ে বলে—'খাম খাম! ক-খাম, ক্ষুৎ-খাম! কিং খাম—কং খাম!'

কেউ গরাস গরাস কাদাই খাচ্ছে। কেউ ক্ষুধার জ্বালায় হাঁস-ফাঁস, বাতাস খেয়ে দ্বিগুণ ফুলোচ্ছে পেট। ফুলো ফাঁপা রবারের বেলুনের মতো এমন পাতলা চামড়া তাদের গায়ে যে, পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে যে আগুন জ্বলছে, পেটের হাঁড়ের তলায় তা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কাউকে আর ব'লে বোঝাতে হয় না যে তাদের—

জঠর জ্বলিছে অন্নাভাবে, চিন্তানলে পুড়িছে মাথার খুলি,
মুখে বার হচ্ছে বার বার 'রক্ষাম' আর 'ভক্ষাম' বুলি।

খাবার ইচ্ছা—চরবার বাঞ্ছা যখন খুব জাগলো জীবদের তখন 'ইচ্ছা-বাঞ্ছা'র বীজ ছড়িয়ে দিয়ে প্রজাপতি হেতি হোতিকে বললেন-—

'তোমা দোঁহাকারে গোঁসাই দিলাম কার্যভার
সবার প্রধান হয়ে পালহ সংসার।
জীবে রাখিবা প্রাণের শকতি
গোঁসায়ে রাখিবা অটুট ভকতি॥'

এই ব'লে প্রজাপতি অদৃশ্য। তাঁর বদলে দৃশ্য হলেন—এক জগৎ গোঁসাই। খড়ম-পায়া জগৎ-গোঁসাই কমণ্ডলু করে—খটম খটম চলে।

বিভীতকী হরিতকীর যেন একটা গাছ এমনিতরো মোটা এক ডাণ্ডা হাতে জগৎ গোঁসাইকে অবতীর্ণ দেখেই ভয়ে ভয়ে আর সব জীব চুপ। সবার হ'য়ে হেতি হোতি বলছে—

'বাঞ্ছা তো পালি গোঁসায়ের সংসার
কিন্তু অন্ন বিনা চলা যে ভার।
—ইচ্ছা তো জীবজন্তু চরায়ে বেড়াই,
কিন্তু জলবিন্দু যে মুখে দিবার নাই।

ভক্ষ্য বিনা জীবন রক্ষায় অশক্য, জীবে রাখি কেমনে করতার? দোহাই গোঁসাইজী কিছু খাতি নাই।' এই ব'লে হেতি হোতি এ-ওর বুড়ো আঙুল ধ'রে চুষে খেয়ে ফেলে দিলে। দেখে জগৎ গোঁসাই বলেছেন—

'অহ হ! অয়ং নিজো পরো বেতি—
হোতিরে না খাও হেতি।'

তখন দু'জনে দু'জনার বুড়ো আঙুল চুষে প্রায় তিনভাগ খইয়ে ফেলেছে। জগৎ গোঁসাই যতো বলেন—

'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে নাই
ক্ষয় হবে যে পরমাই—'

কে কার কথা শোনে? ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে হেতি হোতির তখন এ-ওর গালের মাংস কামড়ে খাবার চেষ্টা।

তখন রেগেছেন জগৎ গোঁসাই। বলছেন—

'অমান্য না ক'রো ব্রহ্মবাক্য,
ক'রো না তোমরা খাই খাই;
রাখালী করো গা দুই ভাই,
ভরা ভর্তি গোঁসায়ের সংসার
যে যা চাবে পাবে তাই
নজর করে দেখা চাই।'

দুটো কোলাব্যাঙের মতো ড্যাবা ড্যাবা চোখ ঘুরিয়ে হেতি হোতি চারিদিকে চায়, কোথাও কিছু নাই, গোঁসাই পর্যন্ত অদৃশ্য। কেবল তাঁর বিভীতকী হরিতকী দণ্ড খাড়া আছে।

তখন ভয়াদৃত সব জীবজন্তু ঘেমে নেয়ে উঠেছে। হেতি হোতি আদ্যিকালের জীবদের মধ্যে বলাবলি ক'রছে দু'জনে—

'ভাইরে, কারসাজি ভোজবাজি করতার
বোঝে সাধ্য কার ?
এ যে যাদুবিদ্যে বর্মার।
আমরা ছিলেম না, সে ছিলেম ভালো একপ্রকার,
চিন্তা ছিলোনা'কো বাঁচা কি মরার।
জীবন পেয়ে যে একে হ'তে হ'লো আর!
ভাবনা ক্ষুধার—ভাবনা তৃষ্ণার ;
পালিতে জীবধর্ম গলদঘর্ম
প্রাণ ল'য়ে প্রাণীর টেঁকা ভার!'

দেখতে দেখতে সৃষ্টির প্রাক্কাল মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল কেটে ঘোরতর অমানিশার চেয়ে তিন ডবল অন্ধকার রাত এসে পড়লো। প্রথম সৃষ্টিতে দিন হ'লো খতম। যেমন অন্ধকার নামা, আর জীবজন্তু সব কামড়া-কামড়ি শুরু করা। সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টি বেধে গেল। বিরাট জীবজন্তুদের বিকট হাঁকডাক! চচ্চড় ছিঁড়চে চাম, যেন কলাপাতা ফাড়া হচ্ছে, শালপাতা পাতা হচ্ছে প্রীতিভোজের দিনে।

'ক্ষুৎক্ষাম!' 'রক্ষাম!' 'ভক্ষাম!' শব্দে কান পাতা ভার! হেতি হোতি ভয়ে দুজনে হরিতকী বিভীতকী ডাণ্ডার আগায় বসে লক্ষ্মীপ্যাঁচা আর হুতুমপ্যাঁচার মতো ক্ষুধায় ভয়ে কাঁপছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। এমন সময় সকাল হ'লো সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনের।

প্রজাপতি এসে দেখলেন পুরাকালের জীবজন্তুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাড় পাঁজরাগুলো প'ড়ে আছে যেন জাদুঘরে সাজানো। দ্বিতীয় দিনে আবার সৃষ্টির বীজ ছড়ালেন প্রজাপতি। কিছু এবার রইলো, কিছু রইলো না রাত্রিকালে। এমনি করে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম দিনে কিছু রইতে কিছু বইতে সৃষ্টির পত্তন হ'লো সুনিশ্চিত।

তখন রাতে রাতে জোনাকি পিতুম জ্বালায়।

চার প্রহরে শৃগাল পাহারা হেঁকে যায়॥

জগৎ গোঁসাই আবার দেখা দিয়ে ব'ললেন—

'হেতি হোতি চলে যাও, ব'সে থেকো না।'

হেতি হোতি বললে—

'ক্ষুৎখাম—ক্ষখাম—কিংখাম—'

'ভবের হাটে ঘোল খাওগে!' বলে জগৎ গোঁসাই অদৃশ্য।

হেতি হোতি চ'ললো ঘোল খেতে ভবের হাটে। সে একটা মস্ত ইতিহাস! তার হিসাব-নিকাশ পাবে সাতকাণ্ড রামায়ণের তিনশো বত্রিশ পাতে।

মডার্ন রূপকথা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খাজনাবাদের রাজা ছটফট সিং রোগে দু'বৎসর শয্যাগত। ডাক্তার কবিরাজ দেখে হিমসিম খেয়ে গেছে; রাজার রোগ আর সারে না। রোগ এমন কিছু নয়; রাজার কোনো কিছুতেই রুচি নেই। দিন-রাত শুয়ে আছেন আর হাই তুলছেন।

রাজা ক্রমে নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। রাজার এক ছেলে। ডাগর; কলেজে পড়েন। নাম কুমার গজপতি সিংহ। পড়াশুনো হচ্ছে কেমন, সে খবর কে-বা রাখে। তবে কুমার বাহাদুরের গল্প লেখার শখ। গল্প লেখেন; লিখে সে গল্প মাসিকপত্রে পাঠান ছাপাবার জন্যে। তারা ছাপে লেখা যেমন হোক, লেখক একজন রাজপুত্র। রাজপুত্রের লেখা ছাপলে গ্রাহক বাড়বে।

কিন্তু এ-কথাগুলোর সঙ্গে আমাদের গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই, আমাদের সম্পর্ক কুমার বাহাদুরের সঙ্গে।

রাজার কাছ থেকে টেলিগ্রাম গেল কুমার বাহাদুরের নামে: তুমি এসো,—জলদি! টেলিগ্রাম পাবামাত্র কুমার বাহাদুর এলেন খাজনাবাদের প্রাসাদে।

রাজা বললেন, 'আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি বাপু বুঝে নাও। দেখে-শুনে বিয়ে করো। বিয়ে ক'রে গদি চেপে ব'সে করো রাজত্ব। রাজ্য-চালনায় এখন কোনো ফ্যাসাদ নেই। শত্রুর ভয় নেই। শুধু বাজে-খরচ বাঁচিয়ে চলা। কতকগুলো মোসাহেব পোষা—সে কাজটি ক'রো না। মাঝে-মাঝে কলকাতায় ছোটা—

সেটুকু বন্ধ রাখতে হবে ; রেস খেলো না, তবে রেসের ঘোড়া কিনতে চাও কিনো। বাংলা লেখার নেশায় মেতো না, অনেক পাব্লিশার মাথায় হাত বুলোবে। স্রেফ খাজনাপত্র আদায় ক'রো,—বন্যা-টন্যা হ'লে যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা, আয় বুঝে ব্যয় করা—রাজ্য খাসা চ'লে যাবে।'

কুমার বাহাদুর বললেন, 'বেশ।'

রাজা বললেন, 'বিয়ে যা করবে বড়ো ঘরে করা চাই।—আচ্ছা, বেশ, তুমি রাজবাড়ির পাঁচতলার ছাদে গিয়ে ওঠো, উঠে দূরবীন ক'ষে চারদিকে ছাখো। দেখে যা বলবার থাকে, এসে আমায় বলো।'

কুমার বাহাদুর গেলেন ছাদে, রাজা গড়গড়ার নল মুখে তুলে তাতে দিলেন টান। তারপর হাঁকলেন, 'ছপ্পড় সিং!'

ছপ্পড় সিং খাস খানসামা। রাজার ডাকে ছপ্পড় এলো। রাজা বললেন, 'তোরাই আমাকে মারবি! কখন তামাক দিয়েছিস, আগুন থাকবে কেন? নিয়ে আয় এক কলকে তামাক সেজে।'

রাজা একালের হ'লেও তাঁর চাল-চলন ছিল সেকালের মতো। তিনি সিগার, সিগারেট, বিড়ি মুখে স্পর্শ করেন না : ও-সব শস্তার নেশা। আলবোলা বনেদি জিনিশ। রাজার ঝোঁক বনেদির দিকে।

ছাদে উঠে দূরবীন ক'ষে রাজপুত্র চারধার দেখতে লাগলেন।

দূরে, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে কী ঐ গোলাপি আভার মতো? আভার মুখে মিশকালো ধোঁয়া! যেন···যেন···

ঠিক! রাজপুত্র দেখেন, সেই আভার মধ্যে চমৎকার একখানা মুখ। গোলাপ-বরণ এক কন্যা মেঘের কোলে দাঁড়িয়ে আছে। ও তো ধোঁয়া নয়, রেশমের মতো কালো চুল কন্যার মাথা থেকে পা ব'য়ে ঝ'রে পড়েছে!

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন, ডাকলেন, 'বাবা! কন্যার সন্ধান পেয়েছি!'

রাজা বললেন, 'বটে! কোথায়?'

রাজপুত্র বললেন, 'অনেক দূরে, আকাশের গায়ে গোলাপ-বরণ কন্যা। তার মাথার কেশ যেন ঝ'রে পড়েছে শ্রাবণের মেঘের মতো একেবারে এই পৃথিবী ছুঁয়ে।'

রাজার দুই চোখ কপালে উঠলো। তিনি বললেন, 'আরে, ও কন্যাকে বিয়ে করবি কী! ও কি এ মুল্লুকের? ও তো সেই রূপকথার রাজকন্যা, থাকে কল্পনার পুরীতে! পাথরের পুরী! সে পুরী চৌকি দিচ্ছে বাঁটুল রাক্ষস! ও কন্যা দেখতে পারি! কথা কয় যেন মানিক জ্বলে! কন্যার হাসিতে মুক্তো ঝরে। কিন্তু ও কন্যা পাবি কেন! পাবার নয়।'

রাজপুত্র বললেন, 'ঐ কন্যা পাওয়া চাই। রাজপুত্রেরা চিরদিন বিয়ে করেছে অমনি রাজকন্যা। আমি রাজপুত্র। বিয়ে যদি করি তো ঐ কন্যাকে বিয়ে করবো। ও কন্যা ছাড়া আর-কোনো কন্যাকে বিয়ে করবো না।'

রাজপুত্র নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ক'রে গোঁসা-ঘরে প'ড়ে রইলেন। রাজা দেখলেন, বিপদ! রানী বহুদিন পূর্বে মারা গেছেন। মা-মরা ছেলেকে চিরদিন আদর দিয়েছেন, তার আদরও ভীষণ হ'য়ে উঠেছে: যা চায় তা পেতেই হবে! কিন্তু তা ব'লে ঐ কল্পনাপুরীর রাজকন্যা!. কুয়াশা নদীর পারে, আজগুবি জঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড়ের মাথায় থাকে কল্পনা-পুরীর রাজকন্যা।

কিন্তু ছেলের ধনুর্ভঙ্গ পণ! রাজা কী করেন, বললেন, 'গোঁ ধরেছো,—বেশ, যাও বাপু। চিঠিপত্র লিখো, আর হুঁসিয়ার হ'য়ে যেয়ো। ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ। বিপদ পদে পদে। কত রাজপুত্র তোমার পূর্বে ঐ রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়েছেন, তাঁরা কেউ ফেরেন নি। সেই কল্পনাপুরীর মায়া-বাতাসের ছোঁয়াচ লেগে পাথরের স্ট্যাচু ব'নে গেছেন।'

রাজপুত্র রাজ্য ছেড়ে বেরুলেন। হাতি বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন না, তিনি চললেন মোটর-বাইকে চ'ড়ে। বাইকের সঙ্গে রইলো বাস্কেট: রাজকন্যাকে তাতে বসিয়ে আনবেন।

চলেছেন, চলেছেন। কত নগর-গ্রাম, পথ-ঘাট, জলা-জঙ্গল, নদী-পাহাড় পার হ'য়ে এক জায়গায় ছোটো সরাই। রাজপুত্র সেই সরাইয়ে রইলেন রাত্রির মতো।

সকালে বেরুলেন। সামনে একটি লোক। সে বললে, 'কোথায় চলেছেন রাজপুত্র?'

রাজপুত্র বললেন, 'কল্পনাপুরীর রাজকন্যার সন্ধানে।'

লোকটি বললে, 'আমায় সঙ্গে নিন, উপকার পাবেন।'

রাজপুত্র বললেন, 'তুমি যাবে!'

সে বললে, 'যাবো। এখানে চাকরি-বাকরি নেই। চিরদিন রাজা-রাজড়ার কাছে কাজ করেছি, এখন এ-সব ছোটো-মন হঠাৎ-বাবুদের কাছে চাকরি করতে শরম লাগে। অনেক কাজ আমি জানি। সেকালের রাজপুত্রেরা কেশবতী রাজকন্যা, চম্পাবতী রাজকন্যার সন্ধানে যা করেছে, তা এই আমারই বাপ-ঠাকুর্দার কল্যাণে।'

'বটে!' রাজপুত্র বললেন, 'বেশ, এসো আমার সঙ্গে। তোমার নাম?'

লোকটি বললে, 'আমার নাম রকেট। এটা নাম নয়, উপাধি। রাজাদের যেমন উপাধি সিং, লাল, রায়, আমাদের উপাধি তেমনি রকেট। হাউই। অনেকে হালের ফ্যাশানে আমাকে মিস্টার রকেট ব'লে ডাকে। তার কারণ, আমাদের বংশ মন্ত্রসিদ্ধ। সে মন্ত্রের জোরে—এই দেখছেন আপনাদের মতো আমার সাধারণ মানুষের আকার—মনে করলে এ-দেহকে আমি সরু ডিগডিগে ক'রে শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে চড়াতে পারি, দেখবেন?'

মিস্টার রকেট নিমেষে দম বন্ধ ক'রে দাঁড়ালো। অমনি তার দেহখানা বাজির মতো শোঁ ক'রে উঠে গেলো আকাশের দিকে; তবে, দোকানের হাউই যেমন মাটির স্পর্শ ত্যাগ ক'রে যায়, রকেটের দেহ ভূমির স্পর্শ ত্যাগ ক'রে গেলো না। সে রইলো মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে। ভীষণ লম্বা সে মূর্তি। হাত বাড়ালে গোটা সূর্যটাকে বুঝি আকাশ থেকে পেড়ে নামাতে পারে।

তার কীর্তি দেখে রাজপুত্র অবাক।

রকেট বললে, 'কল্পনাপুরী দেখতে চান তো আমার কাঁধে উঠুন।'

রাজপুত্র তার কাঁধে চড়লেন। কী ক'রে? যারা কখনো হাতি বা উটের পিঠে চড়েছো, তাদের আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। কাঁধে উঠে রাজপুত্র দেখেন, বহু দূরে টালার ট্যাংকের মতো মস্ত একটা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অনেক উপরে। আর তার জানলায় দাঁড়িয়ে সেই গোলাপ-বরণ রাজকন্যা, মুখখানা মলিন। দেখে রাজপুত্র একটি নিশ্বাস ফেললেন।

রকেট বললে, 'দেখেছেন?'

রাজপুত্র বললেন, 'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা নামুন। আমিও দেহখানিকে গুটিয়ে চ'ড়ে বসি আপনার গাড়ির বাস্কেটে।'

তাই হ'লো। মোটর-বাইক শ'দুই মাইল পথ অগ্রসর হয়েছে, পিছন থেকে কে ডাকলো, 'রক, রক, ওহে মিস্টার রকেট!'

রকেট বললে, 'একবার দাঁড়ান তো রাজপুত্র! আমার বন্ধু বুলাতিংয়ের গলা শুনছি যেন।'

বাইক দাঁড়ালো। একটা জামরুল গাছের তলা থেকে এলো মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। এসে সে রকেটকে বললে, 'কোথায় চলেছো?'

রকেট বললে, 'রাজপুত্রের সঙ্গে যাচ্ছি কল্পনাপুরীতে, গোলাপ-বরণ রাজপুত্রীর সন্ধানে। যাবে?'

—'গাড়িতে ধরবে?'

রকেট বললে, 'আমার বন্ধুকেও সঙ্গে নিন রাজপুত্র। ও-ও একজন ওস্তাদ। দেখবেন ওর ওস্তাদি?'

রাজপুত্র হতভম্ব! এদিকে জনপ্রাণীর দেখা মেলে না—যে দু-চারজনকে পাওয়া যায় সবাই ওস্তাদ।

বুলাতিং বললে, 'আমি সঙ্গে থাকলে কাজ পাবেন রাজপুত্র।'

কথাটুকু ব'লে বুলাতিং ঝপ ক'রে দিলে একটি লাফ—তারপর মাথা নিচু ক'রে বোঁ বোঁ দু'পাক ঘুরে নাচের ভঙ্গিতে দুটো হাত নাড়তে লাগলো। অর্থাৎ তোমরা দেখেছো নিশ্চয়, আগ্নেয়গিরির বুক থেকে গলিত লাভা চারদিকে কেমন ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা বরফের চাঁই গ'লে কেমন জলের বিস্তার ঘটে,—তেমনি বুলাতিংয়ের দেহ মুহূর্তে সেই লাভার মতো থেবড়ে একেবারে দশ-বারো মাইল পথ লুটিয়ে গেলো। গাছে চ'ড়ে রাজপুত্র কোনোমতে সে-যাত্রা চুবন থেকে রক্ষা পেলেন। এমন ওস্তাদ বুলাতিং,—কাজেই তাকেও সঙ্গে নেওয়া হ'লো।

আরো শ'তিনেক মাইল পরে আরেক জন বন্ধু জুটলো। তার পরনে সাহেবি পোশাক। নাম এক্স রায়। বিলিতি ছাঁদে সে নিজের নাম রেখেছে, এক্স-রে—'রায়' বললে লোকে ভাববে ড্যাম কালা আদমি, তাই। তার ক্ষমতা আরো অদ্ভুত। পাথরের পাঁচিল ফুঁড়ে তার নজর চলে, গভীর জল বিঁধে তার নজর চলে অতল তলে, একেবারে সেই মণি-প্রবাল দ্বীপের খনিতে।

যেতে-যেতে রাজপুত্র ভাবলেন, সেকালে এমনি অভিযানে বেরিয়ে যে-সব রাজপুত্র পথে এমন বন্ধু লাভ করেছিলেন, তাঁরাই শুধু চতুর্দোলে বসিয়ে রাজকন্যা-সমেত রাজ্যে ফিরেছিলেন; যাঁদের বন্ধু-লাভ ঘটেনি, তাঁরা পাথরের স্ট্যাচু ব'নে ছিলেন। সে স্ট্যাচুর কি সংখ্যা ছিলো! এ-যুগের ইতালিয়ান জাত স্ট্যাচুর যে অতো বড়াই করে, এ বড়াই শুধু সেইসব রাজপুত্রদের পাথরের কল্যাণেই তো!

রাজপুত্র বললেন, 'এক্স রায়, তুমি একবার ছাখো তো, রাজকন্যা কী করছেন এখন?'

এক্স রায় বললে, 'বেশ!'

রকেট হুশ ক'রে শরীরটা সিড়িঙ্গে সরু ক'রে উঠে গেল আকাশের দিকে মাথা তুলে, এক্স-রে চড়লো তার ঘাড়ে। কল্পনাপুরীর দিকে চেয়ে এক্স-রে বললে, 'পুরীর ফটক বন্ধ: লোহার বড়ো-বড়ো রড

দেওয়া ফটক। সেই ফটকের রড ধ'রে রাজকন্যা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ফটকের বাইরে একটা টুল পেতে বাঁটুল রাক্ষস ব'সে তালগাছ দিয়ে দাঁত খুঁটছে।'

রাজপুত্র বললেন, 'তোমরা আমার বন্ধু, ভাই। বন্দিনী রাজকন্যাকে যাতে কল্পনাপুরী থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারি, সেইজন্যে তোমাদের সাহায্য করতে হবে।'

তারা সমস্বরে ব'লে উঠলো, 'নিশ্চয় সাহায্য করবো, কুমার বাহাদুর।'

মোটর-বাইক চললো তারা-বেগে। রাজপুত্র এই বাইক-চালানো বিদ্যেটা খুব ভালো ক'রেই শিখেছেন। সঙ্কল্প আছে, দু-এক বৎসর পরে মোটর-বাইক চ'ড়ে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরুবেন।

পথে বাধা ঘটলো না, এবং সন্ধ্যার পরে সকলে এসে পৌঁছুলেন কল্পনাপুরীর রাজ-প্রাসাদের ফটকে। ফটক খোলা।

পুরীর চারদিকে বিজলি বাতি জ্বলছে। কিন্তু নিঝুম পুরী। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, কারো সাড়াশব্দ নেই। ফটকের পর মস্ত বাগান। বাগানে অসংখ্য শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু। রাজপুত্র শিউরে উঠলেন : এ-সব স্ট্যাচুর বুকে হয়তো প্রাণ এখনো টল-টল করছে, ডাবের পুরু খোলার নিচে জল যেমন, তেমনি!

চারজনে পুরীর এ-ঘরে ও-ঘরে ঢুকলেন ; দরদালান, বারান্দা পার হ'য়ে উঠলেন শেষে প্রাসাদের দোতলায়। ঘরে দালানে বারান্দায়—সর্বত্র শ্বেত পাথরের স্ট্যাচু নিথর দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ঘরে খাবার রয়েছে সাজানো, ঠিক চারজনের মতো। রাজপুত্র বললেন, 'বাঃ। কে যেন টেলিগ্রাম ক'রে গেছে,—চারজনের খাবার মজুত রেখো!'

রকেট বললে, 'কল্পনাপুরীর আয়োজন ভারি নিখুঁত। হিস্ট্রি পড়েন নি?'

রাজপুত্র বললেন, আমার বি-কোর্স। আমি হিস্ট্রি পড়ি নি।'

হেসে বুলাভিং বললে, 'আপনি রাজপুত্র, একদিন রাজা হবেন। হিস্ট্রি আপনার ভালো ক'রে পড়া উচিত।'

রাজপুত্র একটু লজ্জিত হ'য়ে বললেন, 'এবার পড়বো।'

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ক'জনে আবার এলেন দক্ষিণের বড়ো বারান্দায়। আসবামাত্র দেখেন, সেই গোলাপ-বরণ রাজকন্যা। মলিন মুখ, মুখে কথা নেই।

রাজপুত্র ডাকলেন, 'রাজকন্যা...'

পিছন থেকে ভাঙা কাঁসরের আওয়াজের মতো ভাষা ফুটলো, 'জানি, জানি রাজপুত্র, তুমি এসেছো রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।'

চম্‌কে সকলে ফিরে ছাখে, কদাকার-মূর্তি এক বামন: তার মুখখানা লাল টকটক করছে, দাঁতের পাটি ঠোঁটের নিচে ঢাকা থাকে না, কড়ির মালার মতো দুই ঠোঁটের সঙ্গে কে যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

সে বাঁটুল রাক্ষস। রাক্ষস বললে, 'তোমার আগে কত যুগ ধ'রে কত রাজপুত্রই না এলো রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে! সকলে পাষাণ হ'য়ে এখানকার মাটিতে রইলো এঁটে। এবার তোমার পালা! বেশ, চেষ্টা করো। রাজকন্যাকে নাও, যেখানে খুশি রাখো। তিনটি দিন ওকে পাহারা দাও। তোমাদের পাহারা এড়িয়ে রাজকন্যা যদি চ'লে না আসে, তাহ'লে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজ্যে ফিরো, নাহ'লে তোমাদের ভাগ্যেও পাথর বনা ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।'

বাঁটুল রাক্ষস এই কথা ব'লে চ'লে গেলো। রাজপুত্র তখন রাজকন্যার হাত ধ'রে তাঁকে নিয়ে এলেন দোতলার ড্রয়িং রুমে। রাজপুত্র বললেন, 'তুমি যেন এ-ঘর থেকে চ'লে যেয়ো না রাজকন্যা। শুনলে তো, তুমি চ'লে গেলে আমাদের কী গতি হবে!'

রাজকন্যা কোনো জবাব দিলেন না, তাঁর চোখে কোনো ভাব ফুটলো না। তিনি একখানা চেয়ারে বসলেন। নির্বাক পুতুলের মতো ব'সে রইলেন।

এরা রইলো পাহারা।

ঘর জুড়ে বুলাতিং একেবারে বিগলিত পঙ্ক-কর্দমের মতো নিজেকে দিলে ছড়িয়ে। তাকে সরিয়ে ঘর থেকে নড়বার সাধ্য কী! রকেট ডিগডিগে সরু সাপের মতো কুণ্ডলী রচনা ক'রে গণ্ডী দিয়ে প'ড়ে রইলো; আর এক্স রায় রইলো ঘরের বাইরে, তার ছুঁচের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মুখ ক'রে। রাজপুত্র আরেকখানি চেয়ারে ব'সে রইলেন, রাজকন্যার ঠিক সামনাসামনি।

রাজকন্যা যেন পুতুল। রাজপুত্র বাইরের পৃথিবার কত গল্পই বলতে লাগলেন। কল্পনা-ছাড়া বাস্তব রাজ্যের কত সুখ, কত সম্পদ—বললেন, মুক্তোফলের চেয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে অনেক বেশি ভালো; মনোরথের চেয়ে মোটরে-এরোপ্লেনে চ'ড়ে বেড়ানোর মজা ঢের বেশি—তাও বললেন। রাজকন্যা কিন্তু চুপচাপ ব'সে আছেন। ঠোঁট নড়ে না। চোখের পাতা পড়ে না। রাজপুত্র বুঝলেন, বহু, বহু বৎসরের বন্দিত্বে রাজকন্যার মন পাথর হ'তে শুরু হয়েছে। উপায় কী? বিজ্ঞানের অমোঘ বিধি!

কিন্তু ক'দিন সমানে পথ চলা, ঘুমের অপরাধ ছিলো না। ক'দিন সজাগ চোখের দিকে সে ঘেঁষতে পারে নি। আজ আর থাকতে পারলো না; সকলের চোখের উপর আসন পেতে বসলো। শেষরাত্রে চারজনের চোখ ঘুমে একেবারে জড়িয়ে এলো। চারজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।...

ভোরের দিকে রাজপুত্রের ঘুম গেলো ভেঙে, বুকে কেমন ব্যথা ধরার ফলে। চোখ মেলে তিনি ছাখেন, কোথায় রাজকন্যা? নেই!

বন্ধুদের তিনি ডেকে তুললেন। ব্যাপার দেখে সকলের চক্ষুস্থির।

এক্স রায় দেওয়াল ফুঁড়ে, পাহাড়-বন-নদী ফুঁড়ে, ছুঁচের মতো দৃষ্টি চালিয়ে দিলো দূরে, বহু দূরে। চোখে যা দেখলো...দেখে সে বললে, 'ঐ যে রাজকন্যা! এখান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে সিলোনের অশোক-বন। সেই বনে সবচেয়ে বুড়ো অশোক গাছের

মগডালে একরাশ ফোটা অশোক-ফুলের উপর তিনি শুয়ে আছেন। খুব উঁচু গাছ।'

রকেট বললে, 'কুছ পরোয়া নেই। রাজপুত্র, আপনার বাইক বের করুন।'

তখনই বাইক বেরুলো, এবং...

অশোক-বনে রকেট দিলো তার দেহ শিড়িঙ্গে সরু ক'রে মাথাটা আকাশে তুলে। চকিতে রাজকন্যাকে অশোক-শয্যা থেকে নামিয়ে বাইকের বাস্কেটে বসানো হ'লো।

অমনি পিছনে হা হা অট্টহাস্য। চম্‌কে সকলে ঢ্যাখে, সেই বাঁটুল রাক্ষস।

রাক্ষস বললে, 'একটা রাত্রি কাটলো। এখনো দু-রাত হুঁশিয়ার পাহারায় রাজকন্যাকে ধ'রে রাখা চাই।...'

নিরুপায়! সে-রাত্রেও ঠিক এমনি ব্যাপার। শেষরাত্রে সেই কাল-ঘুম চকিতের জন্যে। ঘুম ভাঙতে সকলে ঢ্যাখে—রাজকন্যা নেই।

এক্স-রে ছুঁচ-দৃষ্টিতে চারদিক ফুঁড়ে বিঁধে বললে, 'ইস—চালান দিয়েছে একদম সেই হিমালয়ের মাথায় যে কাঞ্চনঝঙ্ঘা, সেইখানে! সর্বনাশ!'

রকেট বললে, 'ভয় নেই। আমি এখান থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে এনে দিচ্ছি।'

হ'লোও তাই। দেহকে সরু লিকলিকে ক'রে কঞ্চির মতো বাঁকিয়ে রকেট নুয়ে বেঁকে নিয়ে এলো রাজকন্যাকে। তাঁর দেহ একেবারে হিম; মাথায় বরফের কুচো দানা মিছরির মতো প্রত্যেকটি কেশে জড়িয়ে আছে।

বাঁটুল রাক্ষস বললে, 'আরেকটা রাত!...তারপর...' সে দাঁত-কিড়মিড় ক'রে উঠলো। দু-চোখে যেন হাজার-হাজার লাল জবা ফুটলো।

বারে-বারে তিন-বার। রাজপুত্র বললেন, আজ আর ঘুম নয়!'

বন্ধুরা বললে, 'না। চোখে আজ লঙ্কার কাজল লাগাবো!'

কিন্তু সব বৃথা হ'লো। লঙ্কার কাজল মুছে ঘুম এসে শেষ-রাত্রে চারজনের চোখের পাতায় তাঁবু পাতলো।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে সকলে ছাখে, আবার সেই কাণ্ড।

এক্স রায় বললে, 'ঐ যে রাজকন্যা! জাপানের কাছে সাগরের জলে শুক্তির রাজ্য, সেই রাজ্যে শুক্তিরাজ্যের মুক্তো-গুহায় বন্দী ক'রে রেখেছে।'

বুলাতিং বললে, 'বটে! আমাকে তবে নামতে হ'লো কোমর বেঁধে!'

বুলাতিং বসলো কল্পনাপুরীর বাগানে দিঘির ধারে, ব'সে দেহখানাকে পাত ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, যেন দিঘি-জোড়া একখানা পদ্মপাতা ভাসছে। দেখতে দেখতে চারদিকে বন্যা এলো প্রবল বেগে।

দিঘির জল গায়ে সব শুষে নিলে। তারপর সাত সাগরের জল বুলাতিংয়ের সেই শোষণ-টানে গ্রাম-নগর মাঠ-ঘাট ব'য়ে প্রচণ্ড স্রোতে তার গায়ে এসে পড়তে লাগলো। দেখতে-দেখতে বুলাতিংয়ের আকার হ'লো যেন এক অতিকায় পাঁউরুটির মতো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জলে ভর্তি। হাঙর, কুমির, তিমি, শুশুক, অক্টোপাসগুলো শুকনো ডাঙায় ধড়ফড় ক'রে মরে! বড়ো-বড়ো জাহাজ চলছিলো বেসাতি ব'য়ে, যাত্রী ব'য়ে; সেগুলো চড়ায় আটকে গেলো। পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ রব উঠলো।

এক্স রায় বললে, 'ঐ যে…ঐ বড়ো মুক্তো! ওর মধ্যে আছেন রাজকন্যা!'

রকেট তার লম্বা হাত বাড়িয়ে নিলো সে মুক্তোটা কুড়িয়ে, তারপর রাজপুত্রের হাতে মুক্তো দিলো। রাজপুত্র আঙুলের চাপে সেটি ভাঙলেন; ভাঙবামাত্র চোখের সামনে উদয় হলেন গোলাপ-বরণ রাজকন্যা।

রাজকন্যা বললেন, 'নমস্কার রাজপুত্র!'

আঃ! রাজকন্যার মুখে কথা শুনে রাজপুত্রের আনন্দ ধরে না।

সাত সাগরের যতো হাঙর, কুমির, অক্টোপাস, তিমির দল চ্যাচাতে লাগলো, 'জল গো, জল! প্রাণ যায়!'

বুলাতিং বললে, 'ঐ বাঁটুল রাক্ষসের অত্যাচারে তোমরা মরতে বসেছো। ওর বিহিত করো, তবে কুলকুচো ক'রে সাতসাগরের জল দেবো উগরে।'

তারা বললে, 'বটে! এখনি!'

নিমেষে কুরুক্ষেত্র বাধলো। পুরাকালে সমুদ্রমন্থনে নাকি এমনি সমারোহ ঘটেছিলো, তারপর ঘটে সেবার সেই জার্মান ওয়ারে। না-হ'লে এমন বিপ্লব পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেনি।

অক্টোপাস ফুঁসে তেড়ে এসে তার আটটা বাহু দিয়ে বাঁটুলকে চেপে ধরলে, কুমির তার কাঁটা ল্যাজের চাবুক দিয়ে কষিয়ে দিলে সজোরে। বাঁটুলের হাড়-পাঁজরা গেলো ভেঙে। হাঙর এসে গলা থেকে ধড়টা কেটে বাঁটুলকে গিলে ফেললে। মুণ্ডুটা গড়াতে-গড়াতে পড়ছিলো, শুশুক দেহের রোলার চালিয়ে মুণ্ডুটাকে পাহাড়ের গায়ে চেপ্টে যেন লুচির লেচি বানিয়ে ছেড়ে দিলে।

তারপর?

রাজপুত্র এলেন রাজকন্যাকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে। বুড়ো রাজা ছেলের খবর না পেয়ে মরো-মরো হ'য়ে পড়ে ছিলেন। রাজপুত্র ফিরতে তাঁর রোগ গেলো সেরে, এবং খুব ধুমধামে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন কল্পনাপুরীর রাজকন্যার সঙ্গে। বাস্তব রাজ্যের রাজপুত্র আর কল্পনাপুরীর রাজকন্যার বিবাহ: পৃথিবী জুড়ে যত দেশ আছে, সব দেশের খবরের কাগজে সে সমারোহের ছবি ছাপা হ'লো। তোমরা সে-সব ছবি নিশ্চয়ই দেখেছো। তাছাড়া সিনেমার ফিল্মে Topical Gezette-এ। মনে পড়ছে না? মনে ক'রে ছাখো—দেখেছো বৈ-কি! সেই-যে কল্পনাপুরীর রাজকন্যা আর বাস্তবরাজ্যের রাজপুত্রের বিয়ে—শাঁখ বাজছে!

সূচিকাভরণম্

নরেন্দ্র দেব

ছকড়ি, নকড়ি পাশাপাশি বাড়ি। জ্ঞাতি ভাই তারা, অবস্থা ভালো। অভাব নেই কিছু। তফাতের মধ্যে ছকড়ির একতলা বাড়ি, আর নকড়ির দোতলা বাড়ি। নকড়ি নারকেল চালানের ব্যবসা করে। ছকড়ি করে ছুঁচের কাজ। অর্থাৎ, যত লোকের যত কিছু শেলাইয়ের দরকার ছকড়ি একদিনে ক'রে দেয়, সবাই আশ্চর্য হ'য়ে যায়! ভেবে পায়না লোকে যে কী করে ছকড়ি ছত্রিশটা শেলাইয়ের কাজ ছ-ঘণ্টায় ক'রে দেয়। কিন্তু ক'রে দেয় ঠিক। কাজেই রাজ্যের যত লোক ছকড়িকেই দিয়ে যায় তাদের যা-কিছু দরকারি শেলাইয়ের কাজ। ছকড়ির তাই অভাব নেই কিছু।

নকড়িরও নারকেলের কারবার একচেটে বললেই হয়। তার উঠোনে জ'মে থাকে বারোমাসই নারকেলের পাহাড়। দেশ-বিদেশে প্রতি সপ্তাহে চালান যায় জাহাজ ভ'রে, আবার এসে জমা হয়ে যায় নানান জেলা থেকে সপ্তাহকালের মধ্যে। আমদানি রপ্তানিই তার কাজ।

ছকড়ির একটা বাঁধা আয়ও ছিলো। নকড়ির নারকেল চালানের জন্যে প্রতি সপ্তাহে বড়ো-বড়ো মজবুত চটের থ'লে বা বোরা শেলাই ক'রে সে মাসে-মাসে মোটা টাকা মজুরি পায়।

অবলীলাক্রমে ছকড়ি তা ক'রে দিচ্ছে দেখে নকড়ির হ'লো এক অশান্তি। সে বড়ো কৃপণ মানুষ। নারকেল চালানের জন্যে এই বোরা তৈরি ব্যাপারটা তার কাছে মনে হ'তো নেহাৎ বাজে-খরচ।

মোটা পুরু চট কিনতে আর ছকড়িকে শেলাইয়ের দাম দিতে তার বুকটা যেন ফেটে যেতো।

একদিন নকড়ি খুব ভালোমানুষ সেজে ছকড়ির বাড়ি গিয়ে বললে, 'তোমার তো ভাই স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই, তবে কেন আর মিছে এত কষ্ট করা? ও কি সোজা ব্যাপার! এ বয়সে এত পরিশ্রম সইবে কেন? তোমার কষ্ট দেখে আমার বড়ো কষ্ট হয়।' ছকড়ি সরল বিশ্বাসে তার কথাগুলোকে সত্য মনে ক'রে নকড়িকে চুপি-চুপি বললে, 'তোমাকে ভাই কানে-কানে বলি, শোনো। কাউকে বোলো না যেন। আমার কাঁচি আর ছুঁচ বিশ্বকর্মার দান। আমার একটুও পরিশ্রম করতে হয় না। ছুঁচে সুতোটা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বলি, "ওঁ সূচিকাভরণম্।" ব্যাস! চক্ষের নিমেষে সব শেলাই হ'য়ে যায়। তোমার মোটা পুরু চটের থান যেই পাঠাও, কাঁচিটি মাথায় ঠেকিয়ে তার উপর রেখে জোড়-হাত ক'রে শুধু বলি, "শতেকং বা সহস্রেকং।" অর্থাৎ, যখন যেবার যতগুলি থলির অর্ডার আসে তোমার, সেইবার সেই রকম ব'লে দিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোই। উঠে দেখি সব রেডি।'

কথাটা নকড়ি বিশ্বাস করলে না। বিশ্বাস করলে যে তার মনের অশান্তি আরও বেড়ে যাবে! মনে হবে ছকড়ি সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়েই টাকাটা নিচ্ছে! আবার অবিশ্বাসও পুরোপুরি করতে পারছে না এই ভেবে যে, ওইরকম একটা ভৌতিক বা অলৌকিক কিছু না হলে এত শেলাই ঠিক সময়ে ও করে দেয় কী ক'রে?

ক্ষুণ্ণমনে বাড়ি ফিরে এলো নকড়ি। এসেই দেখে একলক্ষ নারকেল পাঠাবার জন্যে অর্ডার এসেছে বিদেশ থেকে। শনিবার জাহাজ ছাড়বে, এর মধ্যে যেন অতি অবশ্য জিনিশটা পাঠানো হয়, দাম যদি বেশি দিতে হয় রাজি আছি।

নকড়ির মাথায় এক দুর্বুদ্ধি এলো। একলক্ষ নারকেল পাঠাতে খুব কম হ'লেও একহাজার বোরা চাই। একহাজার বোরা শেলাই

করতে ছকড়ি নেবে অন্তত একআনা হিশেবে সাড়ে-বাষট্টি টাকা। এর উপর চটের দাম তো আছেই !

নাঃ! বার বার এত টাকা বরবাদ করা যায় না। নকড়ি স্থির করলে, রাত্রে ছকড়ি যখন ঘুমোবে সেই সময় নিঃশব্দে ওর ঘর থেকে ছুঁচটা তুলে এনে কাজ সেরে আবার ভোর হবার আগেই রেখে আসবে। ছকড়ি তা হ'লে আর কিছুই জানতে পারবে না।

যে কথা সেই কাজ। সারাদিন সে নিজেই ব'সে ব'সে হাজার থলের মতো চট কেটে রেখে দিয়ে সন্ধে থেকে পাশের বাড়ি নজর রাখলে ছকড়ি কখন শুতে যাবে।

রাত্রি দশটার পর ছকড়ির বাড়ির আলো নিভে গেলো। নকড়ি তখন তার চিলেকোঠার উপর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে এলো যে, যাক, ছকড়ি এবার ঘুমিয়ে পড়বে। শোবার ঘরের জানলা থেকে ওর নাক-ডাকার শব্দ পেলেই নকড়ি জানলা গ'লে গিয়ে ওর ছুঁচটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে আসবে।

পা টিপে-টিপে গেলো নকড়ি পাঁচিল টপকে ছকড়ির বাড়ি। শোবার ঘরের জানলার পাশে কান পেতে ঘাপটি মেরে দাঁড়ালো তার নাক-ডাকার শব্দ শোনার জন্যে। বেশিক্ষণ তাকে কষ্ট করতে হ'লো না। দশ-পনেরো মিনিট যেতে-না-যেতেই ছকড়ির নাক যেন ছত্রিশ কড়ি হ'য়ে ডেকে উঠলো : ভোঁ-ভোঁশ ! ভোঁ-ভোঁশ। গাঁ-গাঁফ।

নকড়ি 'দুর্গা' ব'লে জানলা টপকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। হাতের টর্চটা সাবধানে জ্বেলে একটু খুঁজতেই দ্যাখে, সামনের টেবিলেই ছুঁচটা প'ড়ে রয়েছে। নিঃশব্দে ছুঁচটা তুলে নিয়ে সাবধানে বেরিয়ে এলো নকড়ি। মুখে একমুখ হাসি। যাক, এবার তা হ'লে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে!

বাড়ি এসেই রাতারাতি কাজ সেরে নিয়ে ভোরের আগে ছুঁচটা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে ব'লে নকড়ি আর বিলম্ব না-ক'রে ছুঁচের ফুটোয় সুতো পরিয়ে মনে-মনে বললে, 'ওঁ সূচিকাভরণম্।' ব্যাস। তৎক্ষণাৎ

ছুঁচ কাজ শুরু ক'রে দিলো। বিন্-বিন্-বিন্-বিন্। পট্-পট্-পট্-পট্। থ'লের পর থ'লে চক্ষের নিমেষে শেলাই হ'য়ে যেতে লাগলো। নড়কি ছাখে আর আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়ে। ওমা! তাইতো? কী মজা! ছকড়ি মিথ্যে বলেনি!

আনন্দে, উৎসাহে, উত্তেজনায় নকড়ির আর চোখে ঘুম এলো না। সে যত ছাখে তত অবাক হ'য়ে যায়। ছুঁচকে কাজ করতে ব'লে বিছানায় শুয়ে পড়বার কথা নকড়ি একেবারে ভুলে গেল। ভোর হবার আগে হাজার থ'লে শেলাই হ'য়ে গেল। নকড়ি ভাবলে ছুঁচ এবার বিশ্রাম নেবে। নকড়ি তখন ওটা ছকড়ির বাড়ি রেখে আসবে। কিন্তু ছুঁচ আর থামলো না। নকড়ির ঘরের জানলা-দরজায় যত সব ভালো ভালো দামি রঙিন পর্দা টাঙানো ছিলো, পট্-পট্ ক'রে সেগুলো সব শেলাই ক'রে ছোট-ছোট থ'লে বানিয়ে ছেড়ে দিলে। নকড়ি ব্যস্ত হ'য়ে যত বলে,—'আহা-হা! করো কী? করো কী? অ—ছুঁচ! থামো! থামো! ওগুলো নষ্ট কোরো না! লক্ষ্মী দাদা আমার! —ও বোরা-চট নয় ভাই! দামি পর্দার কাপড়, অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি!'—কিন্তু কে সে কথা শোনে? ছুঁচ শেলাই করে, পিছু-পিছু ছোটে নকড়ি, চাপা গলায় ব্যগ্র মিনতি আসে, 'ছুঁচ, থামো!' কিন্তু ছুঁচ থামে না।

জানলা-দরজার পর্দাগুলোকে থ'লে বানিয়ে শেষ ক'রেই ছুঁচ এসে ঠিকরে পড়লো আবার বিছানার বেডকভার ও চাদরের উপর।

নকড়ি এবার চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আর থ'লে চাইনে আমার। দয়া করো ছুঁচ! থামো, তুমি থামো! আমার বিছানার চাদর আর বেডকভারখানি নষ্ট ক'রো না! ও আমার বড়ো শখের জিনিশ!' কিন্তু ছুঁচ থামলো না। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে নকড়ির শখের বেডকভার আর বিছানার চাদর নারকেল চালানের থ'লে হ'য়ে উঠলো।

নকড়ি রেগে উঠে ছুটে গিয়ে ছুঁচটাকে চেপে ধরতে গেল।

কিন্তু এমন প্যাট ক'রে তার হাতে বিঁধে গেলো যে সে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে 'বাপ রে! মা রে! গেছি রে!' ব'লে দশহাত পেছিয়ে এলো।

দূর থেকেই ছুঁচটাকে গাল দিতে লাগলো, 'পাজি নচ্ছার ছুঁচ! বললে কথা শোনে না! থামতে বলছি, তবু থামবে না! শিগ্‌গির থাম্‌ বলছি, নইলে তোর ছুঁচো মুখ ভোঁতা ক'রে ছেড়ে দেবো!'

ছুঁচ নকড়ির কোনো কথাই কানে তুললে না। বেডকভার আর বিছানার চাদরখানাকে থ'লে বানিয়ে সে ঠিকরে এসে পড়লো ঝালর-সিল্কের টেবিলক্লথখানার উপর।

নকড়ি 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ছুটে গেল। 'আরে! আরে! এ তো ভারি বেয়াড়া ছুঁচ দেখছি! ওটা আমার মুর্শিদাবাদি সিল্কের উপর প্রিণ্ট-করা টেবিলক্লথ,—ও কি নারকেল চালানের থ'লে হবার যোগ্য? স'রে যাও, স'রে যাও, ছেড়ে দাও বলছি এখনো!'

নকড়ি তেড়ে এসে টেবিলক্লথখানা দু-হাতে চেপে ধরলে। কিন্তু ছুঁচ তখন শেলাই শুরু করে দিয়েছে। কিছুতেই থামেনা। অগত্যা নকড়ি নিরুপায় হ'য়ে দৌড়ে রান্নাঘর থেকে একটা সাঁড়াশি নিয়ে এসে ছুঁচটাকে প্রাণপণে চেপে ধরলে। বললে, 'তবে রে ছুঁচো! তোর নিকুচি করেছে! আমি কোথায় সাড়ে-বাষট্টি টাকা বাঁচাবার জন্যে তোকে আনলুম,—আর আমার সাড়ে-বারোশো টাকা লোকসান করলি! এইবার তোকে কে রক্ষে করবে? চল্‌, তোকে জ্বলন্ত উনুনের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারবো।' বলতে-বলতে নকড়ি তার হাতের সাঁড়াশি খুব জোরে চেপে ধরলে। কিন্তু, ছুঁচ তৎক্ষণাৎ সাঁড়াশি থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে এত জোরে ফুটে গেলো নকড়ির কাঁধে, যে সে যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ঘরের মধ্যে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে লাগলো। হাত থেকে সাঁড়াশি তার ছিটকে প'ড়ে গেলো।

ততক্ষণে সিল্কের টেবিলক্লথখানাকে শেলাই ক'রে থ'লে বানিয়ে ফেলেছে ছুঁচ। নকড়ির ঘরে মেঝেয় পাতা ছিলো একখানা নতুন

ডিজাইনের দামি পুরু সতরঞ্চি। ছুঁচ এইবার ঠিকরে এসে পড়লো সেই সতরঞ্চির উপর। ব্যাপার দেখে নকড়ি এইবার ডুকরে কেঁদে উঠলো। কাঁধের যন্ত্রণা ভুলে কাঁধে হাত বুলোতে-বুলোতেই সে কাতরভাবে ছুঁচকে মিনতি ক'রে বলতে লাগলো, 'দোহাই তোমার ছুঁচ বাবা! আমার বড়ো সাধের সতরঞ্চি! এখানা ছেড়ে দাও সোনার ছুঁচ! তোমার দুটি পায়ে পড়ি—থুড়ি—তোমার ছ্যাঁদা ফুটো ছুঁচলো মুখের দুপায়ে পড়ি—ওখানা আর ধ্বংস ক'রো না! লক্ষ্মী চাঁদ আমার—'

কিন্তু ছুঁচ তখন সতরঞ্চিখানাকে থ'লে বানাবার জন্যে শেলাই করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। নকড়ি তখন মরিয়া হ'য়ে সতরঞ্চিখানার মাঝামাঝি পায়ের উপর পা দিয়ে বাবু হ'য়ে ব'সে পড়লো। দুপাশে দুটো হাত বাড়িয়ে রেখে সতরঞ্চিখানা সজোরে চেপে ধ'রে রইলো। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে, 'এইবার দেখি তুমি কত বড় পাজি ছুঁচের পো! যত বারণ করছি কথা গ্রাহ্য নেই! কী আক্কুটে সর্বনেশে ছুঁচ রে বাবা!'

কিন্তু, ছুঁচের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চলছে সে শেলাই ক'রে সতরঞ্চিখানাকে থ'লে বানাবার চেষ্টায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই মোটা পুরু নতুন সতরঞ্চি হ'য়ে উঠলো নারকেল চালানের চমৎকার এক বোরা।

কিন্তু নারকেলের বদলে এবার নকড়ি নিজেই প্যাক হ'য়ে গেলো সেই থ'লের মধ্যে। কারণ প্রাণপণে সতরঞ্চি চেপে ধ'রে বসে ছিলো তার মাঝখানে, কিছুতেই ওঠেনি।

বিশ্বকর্মার ছুঁচ সতরঞ্চির মধ্যেই নকড়িকে রেখে চারধার বেশ ক'রে মুড়ে ডবল-শেলাই দিয়ে খুব টাইট আর মজবুত থ'লে বানিয়ে ফেলে রেখে জানলা গ'লে বেরিয়ে গেলো ছকড়ির বাড়িতে। কারণ, রাত্রি তখন প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে। কাক ডাকছে কা-কা ক'রে।

সতরঞ্চির থ'লের মধ্যে আটকা প'ড়ে নকড়ির দম বন্ধ হবার উপক্রম! প্রাণ যায়! সতরঞ্চির প্যাকেটের মধ্যে ছটফট করতে-করতে

সে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করলে, 'কে আছো—বাঁচাও। ম'রে গেলুম।'

ভোর রাত্রে নকড়ির এই করুণ আর্তনাদ শুনে তার স্ত্রী-পুত্রের ঘুম ভেঙে গেলো, পাড়া-প্রতিবেশির ঘুম ভেঙে গেলো। সবাই ছুটে এলো ব্যাপার কী দেখতে। সতরঞ্চির মোড়কের মধ্যে নকড়ি প্যাক করা রয়েছে দেখে সকলেই প্রথমটা খুব আশ্চর্য হয়েছিলো, আর অনেকে হেসেও ফেলেছিলো। কিন্তু নকড়ির করুণ আর্ত চিৎকার শুনে তাদের দয়া হ'লো। তারা সকলেই যে-যার ছুরি-কাঁচি দিয়ে সতরঞ্চির থ'লের শেলাই কেটে দিয়ে নকড়িকে তার ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই তারা সে শেলাই কাটতে পারলে না। সমস্ত ছুরি-কাঁচি ভোঁতা হ'য়ে যেতে লাগলো।

সতরঞ্চির থ'লের ভিতর থেকে নকড়ি তখন হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'আমাকে তোমরা ছকড়িদা'র বাড়ি নিয়ে চলো। তার কাছে বিশ্বকর্মার কাঁচি আছে। সে কাঁচি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রে এ শেলাই কাটা যাবে না বোধহয়।'

সবাই তখন ধরাধরি ক'রে তাকে খাড়া ক'রে দিলে। ভাগ্যে নকড়ি ছেলেবেলায় স্পোর্টসে 'স্যাক-রেস কম্পিটিশনে' ফার্স্ট হ'তো, তাই কোনরকমে সেই সতরঞ্চির পুঁটুলির মধ্যে 'হপ্' করতে-করতে, অর্থাৎ জোড়পায়ে লাফাতে-লাফাতে, ব্যাঙের মতো ছকড়ির বাড়ি চললো। পথে দু-তিনবার উল্টে প'ড়ে সতরঞ্চির থ'লে-সমেত গড়াগড়ি খেলে রাস্তায়। পাড়ার লোকেরা আবার ধ'রে তুলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে পৌঁছে দিলে ছকড়ির বাড়ি।

পাড়া-প্রতিবেশী লোকগুলি ছিলো খুবই ভালো। নকড়ির স্ত্রী-পুত্রকে তারা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো।

ছকড়ি একটা সতরঞ্চির থ'লেকে নড়বড় করতে-করতে এগিয়ে আসতে দেখে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কী!'

পড়ার লোকেরা সব ছকড়িকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। ছকড়ি শুনে এবার হো-হো করে হেসে উঠলো। সতরঞ্চির থ'লের ভিতর থেকে নকড়ি তখন কাতরভাবে চিৎকার করে বললে, 'উ: ! ম'রে গেলুম ! ম'রে গেলুম ! কেটে দে ভাই ছকড়ি-দা ! আর কখনো এমন কাজ করবো না ! আমার খুব শিক্ষা হয়েছে ! বিদ্যাসাগর মশাই ঠিকই লিখে গেছেন, "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে পাপ হয়।" উঃ, প্রাণ যায় !'

নকড়ির করুণ চিৎকারে কাতর হ'য়ে নকড়ির স্ত্রী কাঁদতে-কাঁদতে ছকড়ির পায়ে ধরতে গেলো।

'—থাক থাক বৌমা, কী করো !' ব'লে পা সরিয়ে নিয়ে ছকড়ি বললে, 'আমি এখনি কাঁচি এনে শেলাই কেটে ওকে বার করছি।'

নকড়ি তখন সতরঞ্চির ভিতর থেকে অনুনয় করে বললে, 'দেখো ভাই ! আমার নতুন সতরঞ্চিখানা বাঁচিয়ে কেটো'—

ছকড়ি তখন কাঁচি আনতে চ'লে গেছে ভিতরে। হঠাৎ নকড়ির মনে প'ড়ে গেলো, ছকড়ি যদি ভুলে অভ্যাস-মতো কাঁচিকে বলে, 'শতেকং বা সহস্রেকং,' তাহ'লেই তো সর্বনাশ ! শুধু তার নতুন সতরঞ্চিখানাই হাজার টুকরো হবে না—তার দেহটাও খণ্ড-বিখণ্ড হবে যে।

ছকড়ি এসেছে, তার পায়ের শব্দ পেয়ে সেটা বুঝতে পেরে, এবং তার হাতে নাপিতের চুল-কাটা কাঁচির মতো কচাং-কচাং ক'রে কাঁচির আওয়াজ শুনতে পেয়ে নকড়ি ব্যাকুল হ'য়ে ব'লো উঠলো, থ'লের ভিতর থেকে, 'ও দাদা ! বলো—"একমেবাদ্বিতীয়ম্ !" এবার আর "শতেকং বা সহস্রেকং" বোলো না যেন—দোহাই ভাই !'

তারপর নকড়িকে যখন সতরঞ্চি কেটে বার করা হ'লো, দেখা গেলো,—সে তখন গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে উঠেছে, এবং ভয়ের চোটে এক রাত্রেই তার সমস্ত চুল পেকে শাদা হ'য়ে গেছে।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

সুকুমার রায়

॥ পাত্রগণ ॥

রাম	সুগ্রীব
জাম্বুবান	হনুমান
সভাসদগণ	বানরগণ
বিভীষণ	রাবণ
লক্ষ্মণ	যমদূতদ্বয়
দূত	যম

প্রথম দৃশ্য

রামের শিবির

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে-চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি-সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, হবে না—হ'তে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হ'লো না—সে একেবারে ম'রে গেছে।

সকলে। বাঃ! বাঃ!—একদম ম'রে গেছে—ব্যাস! আর চাই কী, খুব ফুর্তি কর!

(বাইরে গোলমাল) ঐ ছাখ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—
দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে। সেকি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান তো খুব কড়া!

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো সব মাটি করলে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেতো—না, ব্যাটা আবার বিছে জাহির করতে গিয়েছে—'এক্কেবারে ম'রে গেছে—'

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

(দূতের প্রবেশ)

সকলে। কিহে, খবর কী?

দূত। আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ। ব্যাস! মস্ত খবর দিয়েছো আর কী!

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছো? তোপ ফেলতে হবে?

রাম। আজ কী ঘটলো না-ঘটলো সব ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো।

দূত। আজ্ঞে আমি চান-টান ক'রেই, পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিলো, কিন্তু কী হ'লো জানেন? আমার কুমড়োটা প'চে যাচ্ছিলো কিনা—

সকলে। বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল্।

দূত। হ্যাঁ হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাকঢোল বাজছে—ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা-ধ্যার‍্যার‍্যা-ধ্যারা—

সকলে। মার্—ব্যাটাকে মার্—ব্যাটার কান কেটে দে!

জাম্বুবান। ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যা চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!

সুগ্রীব। ব্যাটা তুই ভালো ক'রে ধারাবাহিকরূপে আছোপান্ত পর্যায়-পরম্পরা সব বলবি কি না?

রাম। তারপরে কী হ'লো শুনি—ততঃকিম্?

দূত। (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্কঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে। ততঃকিম্, ততঃকিম্, ততঃকিম্ ?

দূত। শঙ্খ হুলাহুলি সানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝংকার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে। ততঃকিম্, ততঃকিম্, ততঃকিম ?

দূত। লাখো-লাখো সৈন্য চলে সাথে-সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে-পশ্চাতে।

সকলে। ততঃকিম্, ততঃকিম্, ততঃকিম্ ?

দূত। বীরদর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে। ততঃকিম্, ততঃকিম্, ততঃকিম্ ?

দূত। তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চম্‌কে ওঠে।

সকলে। ততঃকিম্, ততঃকিম্, ততঃকিম্ ?

দূত। আজি দুর্দিনেতে নাহি কারো রক্ষা
দলে-বলে সবে পাবে আজি অক্কা।

জাম্বুবান। চোপরও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস!

রাম। তুমি রাবণকে দেখেছো, এখান থেকে কত দূরে ?

দূত। আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে। হ্যাঁ-হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত। আজ্ঞে একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টায় হ'তে পারে।

জাম্বুবান। তুমি কী করে আসছিলে ? হামাগুড়ি দিয়ে ?

রাম। কোন্‌দিকে আসছিলো, বলো তো ?

দূত। আজ্ঞে তা তো জিগেস করি নি!

সকলে। ব্যাটা! তুমি আছো কোন কর্মে ?

রাম। তাড়াতাড়ি আসছিলো, না আস্তে-আস্তে ?

দূত। আজ্ঞে তাড়াতাড়ি—আস্তে-আস্তে। আজ্ঞে—সেটা ঠিক ঠাওর ক'রে দেখি নি!

সকলে। এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে এটাকে তাড়িয়ে দে!

বিভীষণ। (জাম্বুবানের প্রতি) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে-কানে বলবো—

জাম্বুবান। উঃ—ছ্যাৎ! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ. শুনবো না—

দূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঁ—

বিভীষণ। ব্যাটা হাসছিস কেনরে বেয়াদব?

(প্রহার ও অর্ধচন্দ্র)

সুগ্রীব। ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় তো!

সকলে। কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব। রাবণকে ঠ্যাঙাবো।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। রাবণ বোধহয় আসছে।

সকলে। যা-যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব। চলো হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে—

(সকলের উত্থান ও প্রস্থান)

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। (ভয়ে-ভয়ে) কেউ নেই তো? (পাদচারণা)

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ। ছাখো, হাঁটছে ছাখো—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—ছ্যাঃ, যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি ক'রে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট্। (নমুনা প্রদর্শন)

সুগ্রীব। রেখে দাও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ও-রকম হাড়গিলের মতো ক'রে হাঁটে না।

বিভীষণ। তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ তো!

সুগ্রীব। মানুষ বললে কেন হে? খামোকা গালি দিচ্ছো কেন?

জাম্বুবান। (নেপথ্যে) ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে!

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যাঁ! কী?

(গান)

যদি রাবণের ঘুষি লাগে গায়—
তবে তুই ম'রে যাবি—তবে তুই ম'—রে—যা—বি--
ওরে, পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা
তা না-হ'লে ম'রে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে—হঠাৎ একদিন ম'রে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়ছে—একটা বড্ড জরুরি কাজ বাকি আছে—সেটা চট্ ক'রে সেরে আসছি।

(বিভীষণের প্রস্থান)

সুগ্রীব। এইবারে বোধহয় রাবণ আসবে—আজ একটা-কিছু হ'য়ে যাবে—ইস্‌পার নয় উস্‌পার—

(রাবণের প্রবেশ)

(গান)

সুগ্রীব। তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারবো ঝাঁটা
তোরে এখন রাখবে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল।
(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
তোর এখনি হবে প্রাণান্ত
আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্॥

রাবণ। ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব॥
ব্যাটা গুলিখোর, বুদ্ধি নেই তোর নেহাৎ তুই চ্যাংড়া।
আয় তবে আয় যষ্টির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া॥

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময়ে আজি
ইষ্টদেবে কর রে নমস্কার।
তুই রে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার॥

রাবণ ওরে বেয়াদব কহিলে যে-সব
ক্ষমাযোগ্য নহে কখন।
তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ
পাঠাবো শমন সদন॥

(প্রহার)

সুগ্রীব ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি'
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খুঁচাখুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটা হারাবো কি শেষে?

(পলায়ন)

রাবণ। ছি-ছি-ছি,—এত গর্ব ক'রে, এত আস্ফালন ক'রে, শেষটায় চম্পট দিলি! শেম্! শেম্!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

(গান)

রাবণ। আমার সহিত লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত—
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত।
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কী?
কোথায় লাগে বা কুরো পাটকিন
কোথায় রোজেদ ভেনিস্কি?
এই যে অস্ত্র দেখিছ স্পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে,
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানরকুল সমস্তে।
অ-যোদ্ধার লোকে যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাবো শক্তি রাখিব কীর্তি
দলে-বলে সবে নাশিয়া।

লক্ষ্মণ। (লাঠি চালাইয়া) হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর হর হর হর—মার, মার, মার, মার, মার, মার—কাট কাট কাট কাট কাট কাট—

(শক্তিশেলাহত)

হা হতোস্মি! (পতন ও মূর্ছা)

(রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট-লুণ্ঠন)

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। অ্যাঁ! কী হচ্ছে—দেখে ফেলেছি!

(রাবণের পলায়ন)

(অন্যান্য বানরগণের আগমন)

(গান)

বানরগণ। অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—

যষ্টির বাড়ি সুগ্রীবে মারি

কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো ;

অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥

(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা

অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো

অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥

(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া

লক্ষ্মণের ধড়াচুড়ো—

অবাক কল্লে রাবণবুড়ো ॥

(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলেরে

কল্লে ব্যাটা তাড়া হুড়ো

অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো ॥

(ব্যাটা) বুদ্ধি বিপুল যুদ্ধে নিপুণ

কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো,

অবাক কল্লে রাবণবুড়ো ॥

(লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান)

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ]

তৃতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্রের শিবির

রাম। কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিলো—বোধ হয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ। তা হবে !

(খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজ-বদ্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ)

বিভীষণ। আরে ও পালোয়ানজী, একি হ'লো—ষাট ষাট ষাট !

সকলে উচ্চহাস্য

রাম। কিহে সুগ্রীব, তোমার দেখছি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হ'লো!

বিভীষণ। আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফশকা গেরো—

রাম। যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই।

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ।

রাম। আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা!

জাম্বুবান। যোদ্ধা বলে যোদ্ধা—ঢাল নেইতলোয়ার নেইখামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ। আমি বরাবরই ব'লে আসছি—

সুগ্রীব। ছাখ্! তোর ঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম। রাবণের কেন, বলো, এত বাড়াবাড়ি?—

পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা।

রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি,
চ্যাং পুটি যত করে মহা আস্ফালন।

(বাইরে গোলমাল)

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?

সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না তো?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল—ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

(কাঁধে চাপিবার চেষ্টা)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

(সকলে আশ্বস্ত)

রাম। অতো হল্লা ক'রে আসছে কেন? চ্যাঁচাতে বারণ করো।

দূত। আজ্ঞে তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, একরকম আসছেনই বটে—মানে, তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান। লোকটার কান ম'লে তাড়িয়ে দাও তো— ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায় নি?

(লক্ষ্মণকে ধরিয়া সকলের প্রবেশ)

(গান)

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বিক ঘটলো তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ড্যাঙার বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রইলো বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না।
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে-তো ঘটতো আজি হিতে বিপরীত গো।

রাম। হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কী হ'লো, হায় কী হ'লো, হায় কী হ'লো, হায় হায় হায়—(মূর্ছা)

বানরগণ। হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কী হ'লো-হ'লো-হ'লো-হ'লো, হায়, কী হ'লো-হ'লো-হ'লো-হ'লো (ইত্যাদি)।

(মাঝে মাঝে কলা ভক্ষণ)

জাম্বুবান। এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিলো না কি?

সুগ্রীব। হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিলো?

হনুমান। আমি বাতাসা খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব। ব্যাটা তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাওনি!

(গান)

শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
আগে হ'তে পষ্ট ব'লে রাখি।
তুই ব্যাটা জানোয়ার নিষ্কর্মার অবতার
কাজে-কর্মে দিস বড়ো ফাঁকি।
কাজ-কর্ম ছেড়ে-ছুড়ে ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোনরে আদেশ মোর এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট-আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান। (স্বগত) মোটে অষ্ট আনা ?

বিভীষণ। তারপর, তোমাদের মতলব কী স্থির হ'লো ?

সুগ্রীব। এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঠিক কথা।

(জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান)

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধার তোল
(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চৌদ্দ হাজার ঢোল।
কাজ কী ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে—
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুনকালি (তারে) চিমটি কাটো খালি
(তার) চৌদ্দ পুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল করো আরো যে যেকরম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো।

বিভীষণ। এই যে শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন।

রাম। তারপরে—ঔষধপত্রের কী ব্যবস্থা কল্লে ?

সকলে। ঐ যা। ওষুধপত্রের তো কিছু ব্যবস্থা হ'লো না।

রাম। মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা ?

বিভীষণ। মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব। ব্যাস! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর-কি!

সকলে। মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না।

(ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি)

বিভীষণ। বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এককাঠি বাড়া!

জাম্বুবান। (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক, বেরসিক, বে-আক্কেলে, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো-ভূত!

সকলে। রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না। কথাটা শুনুন।

(গান)

আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না?
সংকটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না।
সর্ব কর্মে অষ্টরম্ভা হর্দম প'ড়ে নাক ডাকছে—
উল্টে কিছু বলতে গেলে বিটকেল-বিটকেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এম্নি স্বভাব ছিলো না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে।
হ্যাঙ্গাম দেখে হটলে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কী!
ভেবেই ছাখো এম্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি?
মুখ্খু মোরা আক্কেল-শূন্য এক্কেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুদ্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিছু নেইকো চটবার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং-পদ্মে।

হনুমান। (স্বগত) হ্যাঁরে আমার ল্যাজ মাড়িয়ে দিলি?

রাম। বুঝলে হে জাম্বুবান তুমি কিনা হচ্ছো প্রবীণ লোক—এ-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে-কথা আগে বললেই হ'তো—তা না ব্যাটারা ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রামশাই'—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়লো নাকি!

রাম। হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফ্যালো।

জাম্বুবান। (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট্ ক'রে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান। আচ্ছা, কাল ভোর না-হ'তে উঠে নিয়ে আসবো।

জাম্বুবান। না-না, এত দেরি করলে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান। আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাবো? সাপে কাটবে, না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব। ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ!

জাম্বুবান। না, ওষুধগুলি এখনি দরকার।

হনুমান। আঃ, হোমিওপ্যাথি লাগাও।

জাম্বুবান। যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী—এইসব গাছের শেকড় আনতে হবে।

হনুমান। আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।

জাম্বুবান। আ মরণ আর-কি! এ কি কলকাতা শহর পেয়েছিস নাকি যে বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে, জানিস তো?

হনুমান। কৈলেশ ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান। ব্যাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা কৈলাস পাহাড় জানিস নে?

হনুমান। ও বাবা! সেই কৈলেশ পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অতো দূরে যেতে পারবো না।

জাম্বুবান। যাবিনে কিরে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল ক'রে দেবো! এখনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিসনে।

হনুমান। আমার কান কটকট করছে—

রাম। আহা, যা রে যা, আর গোল করিসনে—নে বকশিশ নে।

(কলা প্রদান)

হনুমান। জো হুকুম।

(কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান)

জাম্বুবান। তারপরে রাত্তিরের জন্য সেনাপতি নির্বাচন করো।

রাম। কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান। তা কেন? একজনকে একটু খবর্দারি করতে হবে তো। তাছাড়া হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে। তাতো বটেই। মন্ত্রীমশাই না হ'লে এমন বুদ্ধি কার হয়!

সুগ্রীব। (স্বগত) হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

(গান)

আমার বচন শুন বিভীষণ
করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ-সজ্জা করো, দিব্য অস্ত্র ধরো
সমরে সত্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক
তোমার অধিক কেবা আছে আর
(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসানো
মুশকিলে আসান প্রসাদে তোমার।

সকলে। ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ। তাইতো! মুশকিলে ফেললে দেখছি!

সুগ্রীব। শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে
বীর বিভীষণে করো সেনাপতি
(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে
যদি যায় ম'রে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে। তাতো বটেই—কিছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান। বেশ তো! তা হ'লে তাই ঠিক হ'লো—খবর্দার। দেখো, ভালো করে পাহারা দিয়ো। কোনো ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না —স্বয়ং যম এলেও নয়। আর দেখো, যেন ঘুমিয়ো না।

(বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিভীষণ। ইকী গেরো! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেলো দেখছি।

(গান)

বিধি মোর ভালে হায় কী লিখিল
আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সংকটেতে ঘোর।
জাম্বুবান বেটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি
তার চক্রে প'ড়ে নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাবো কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হ'তে কহো দেবগণ সবে
আজি এ-সংকটে কী উপায় হবে?
যম-হস্তে আমি না দেখি নিস্তার।
সুযুক্তি তাহার কহো সবিস্তার।
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন, সর্বজনে, মোর মৃত্যু হ'লে
শোক-সভা ক'রো তোমরা সকলে।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির প্রাঙ্গণ

(বিভীষণের পাহারাদারি : মধ্যে-মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি)

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, দেখো যেন ঘুমিয়ো না—বাপু এমন

অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁরে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি!

(পাদচারণা ও উঁকিঝুঁকি)

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার কিছু-কিছু ভরসা হচ্ছে—চাইকি, হয়তো বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে! যাক। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের তো ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখছি না—আর আসলেই বা কী? তাকে বাধা দেওয়াটা তো আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

(উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা)

(জাম্বুবানের প্রবেশ)

জাম্বুবান। দেখেছো, আধঘণ্টা না যেতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে নাক ডাকাতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্!

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিল) কে, কে! ও--জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করেছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি! আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোই নি।

জাম্বুবান। হাঁ হ্যাঁ, আমায় আর সমঝাতে হবে না! দিব্যি পড়ে নাক ডাকাচ্ছে—আবার বলে, সত্যি ক'রে ঘুমোই নি!

বিভীষণ। তুই টের পাসনি?—আমি মিট-মিট করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান। না না, মিটমিট ক'রে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

(প্রস্থান)

বিভীষণ। ব্যাটা তো ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে!

(পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা)

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথম। হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

দ্বিতীয়। আরে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ ; এতদিন কাজ করছি একটা বাড়ি চিনতে পারবো না ?

প্রথম। তোকে কী বাৎলিয়ে দিয়েছিলো বলতো ?

দ্বিতীয়। আমাকে ব'লে দিয়েছে যে, সেই ডান দিকের উঠোনওলা বাড়িটায় যাবি।

প্রথম। ডানদিক তো এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে যাচ্ছে, তবে তো ঠিক এসেছি—

দ্বিতীয়। হ্যাঁ—চল মড়াটা খুঁজে দেখি।

(অন্বেষণ করিতে-করিতে বিভীষণোপরি পতন)

বিভীষণ। কে রে! কে রে!

প্রথম ও দ্বিতীয়। (লাফাইয়া তিন হাত দূরে গিয়া) এটা কী আছে রে! এটা কী আছে রে ?

দ্বিতীয়। ও বাপ্পো—এ মানুস আছে নাকি ?

প্রথম ও দ্বিতীয়। ও বাপ্পো—মানুস ? জীয়ন্ত মানুস ?

(ভয়ে কম্পিত)

দ্বিতীয়। কই রে, কিছু তো বলছে না!

প্রথম। তা'হলে বোধহয় কিছু বলবে না।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা। ওকে জিজ্ঞেস কর তো!

প্রথম। তুই জিজ্ঞেস কর!

দ্বিতীয়। তুই জিজ্ঞেস কর না! আমি তোকে ধ'রে থাকব—

প্রথম। মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই—গরিব বেচারা মশাই—

বিভীষণ। (স্বগত) এ তো মজা মন্দ নয়! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান!

প্রথম। চল, একটু পাশ কাটিয়ে চ'লে যাই।

(পাশ কাটিয়ে যাইবার উদ্যোগ)

প্রথম ও দ্বিতীয়। ওরে না রে চোখ রাঙাচ্ছে—

(গান)

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো ?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো !
এ-সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হ'লে তো না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্তকণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো ॥

বিভীষণ। ভাগ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় ক'রে দেবো।

(প্রথম ও দ্বিতীয়র পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ)

প্রথম। হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথায় ? খালি হাতে গেলে যম কাউকে আস্তো রাখবেন না !

দ্বিতীয়। তাইতো। তাইতো। এ তো ভারি মুশকিল হ'লো—কী করা যায় বল দেখি !

প্রথম। আয় না, আমরা ও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

দ্বিতীয়। যখন পরাজয় খলু অনিবার্য
তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য ?

প্রথম। তবে তো মুশকিল, উপায় কী হবে।
সাধ ক'রে কেবল প্রাণটা হারাবে ?

দ্বিতীয়। আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই।

প্রথম ও দ্বিতীয়। হায় কী ঘটিল হায় কী ঘটিল !
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল ॥

বিভীষণ। ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাবকিয়ে রোগা ক'রে দেবো !

(প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ)

প্রথম ও দ্বিতীয়। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ, আমাদের কিছু দোষ নেই—ওই এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

(যমের প্রবেশ)

বিভীষণ। এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে রাম মারবে। উভয় সংকট! যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়বো না। (সদর্পে) তবেরে ব্যাটা—আমায় চিনিসনে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি? (যম অগ্রসর)

দ্বিতীয়। ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম। হ্যাঁ রে, ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয়। (বিভীষণের প্রতি) পালা, পালা—এইবেলা পালা—

প্রথম। হ্যাঁ, ঐ-যে অস্তর দেখছো ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্টপ্রাপ্তি হবে।

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?

যম। (আবৃত্তি)

কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি॥
সর্বকালে সমভাবে সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি॥
অন্তিমেতে দেখা দিই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে॥
সংসারের মহা-যাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দিই আমিই শমন॥

(পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। জয় রামের জয়!

(যমের মাথায় পাহাড় স্থাপন। যমের পতন)

প্রথম। ও কিরে!

দ্বিতীয়। ঐ-যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম। তাইতো রে, পড়লো যে!

দ্বিতীয়। (সকাতরে) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম। তাইতো! আমারও যে পাওনা আছে!

প্রথম ও দ্বিতীয়। ওগো আমাদের কী হ'লো গো—ওগো, আমরা যে ধনে প্রাণে মলুম গো—(হনুমানের প্রতি) পালোয়ানমশাই গো—সর্বনাশ কল্লেন গো—হায়, আমাদের কী হ'লো গো—

(গান)

প্রথম। ওরে যম ব্যাটা যে দিলো ফাঁকি—

দ্বিতীয়। মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম। আহা ছাখ না ব্যাটা হ'লো নাকি!

দ্বিতীয়। ওর চুলে ধরে দেনা ঝাঁকি।

প্রথম। এই বিপদ কালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিলো ফাঁকি।—অ্যাঁক্—

(হনুমান কর্তৃক গলা পাকড়ানো)

হনুমান। ভাগ ভাগ—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে!

(দূতদ্বয়ের প্রস্থান)

বিভীষণ। এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

(হনুমানের প্রস্থান ও লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ)

সকলে। ওটা কী রে? ওটা কী রে?

হনুমান। আজ্ঞে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান। ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধ নিয়ে এসেছিস?

হনুমান। আজ্ঞে গাছ চিনিনে। আর ঐ নিচেরটা—যমরাজা।

সকলে। আরে আরে করেছিস কী রে ব্যাটা? করেছিস কী?

জাম্বুবান। থাক, অমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা-কিছু গতিক ক'রে নি, তারপর দেখা যাবে—

(ঔষধান্বেষণ—ঔষধ-প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ)

সকলে। বা, বা! কেয়াবাৎ! কী সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান। হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ তো।

সকলে। তাই বলো। স্বদেশী না-হ'লে কি এমন হয়!

জাম্বুবান। হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

(পাহাড় সরাইয়া যমকে মুক্তি দান)

যম। (চোখ রগড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ। তা না তো কী? তুমি জ্যান্তো মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম। আজ্ঞে চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিলো, আমি এখনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি—

(প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিলো—ব্যাটার বুদ্ধি ছাখো।

হনুমান। তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি তো!

বিভীষণ। আমি পাহারা না দিলে ওষুধে কী হ'তো রে—ওষুধ আনতে-আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। আমারই তো বাহাদুরি!

সুগ্রীব। অর্থাৎ কিনা, আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে তো বিভীষণ পাহারা দিলো—আর বিভীষণ পাহারা দিলো ব'লেই যমদূতগুলো আটকা পড়লো।

জাম্বুবান। আরে ব্যাটা, ওষুধের ব্যবস্থা কল্লে কে? তোদের বুদ্ধি সে-সময় উড়ে গেছিলো কোথায়?

রাম। হ্যাঁ সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিগগেস করলে তুমি হয়তো এখনো প'ড়ে নাক ডাকাতে।

লক্ষ্মণ। আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এতসব

কাণ্ড-কারখানা কিছুই হ'তো না—আর তোমরাও বিদ্যে জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান। যাক, এখন মেলা রাত হ'য়ে গেছে, তোমরা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নিদ্রার চেষ্টা ছাখো—তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচবো।

হনুমান। আমায় কিছু বকশিশ দেবে না?

বিভীষণ। হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো

দ্বিতীয়। নটে গাছটি মুড়োলো।

তৃতীয়। ক্যান্‌রে নটে মুড়োলি

চতুর্থ। বেশ করেছি—তোর তাতে কী রে ব্যাটা—

সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থঃ সর্গঃ]

কঙ্কালের টঙ্কার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়েরা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাস্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু ব'লে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার এই কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছো, কবিতা আমার প্রাণ রক্ষা করলে কেমন ক'রে? সত্যি বলছি সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতালক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কী অবস্থা হ'তো তা আমিই জানি।

গল্পটা তা হ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইমটেবল খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হ'লে রাত্রের গাড়িটাই সুবিধে। কিন্তু সে-ট্রেন অনেক রাত্রিতে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো।—এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় কী! আমি স্টেশন মাস্টারকে বললুম, 'কী উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।'

স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জার?'

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল কোম্পানি আধা ভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি শস্তায় বড়োমানুষি করছিলুম। বুক ফুলিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আমার ফার্স্টক্লাসের টিকিট।'

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভালো ব্যবস্থা আছে।'

আমি বললুম, 'কী?'

তিনি বললেন, 'আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে স্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ি ঐ সাইডিংএ কেটে রেখে দেবো। আপনি তাইতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন—লেপ-মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাইতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছোবেন।'

আমি বললুম, 'বাঃ, এ তো বেশ!'

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে ব'লেই তো কোম্পানি বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।'

আমি বললুম, 'খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি তা হ'লে আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক রাখবেন।'

তিনি বললেন, 'গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরি করবেন না। আটটার পর আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় স্টেশন বন্ধ ক'রে চ'লে যাই।'

আমি বললুম, 'আটটার মধ্যেই আসবো।' ব'লে আমি চ'লে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবল মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো-ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েস্টকোট, কোট, ওভারকোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোশ মুড়ি দিয়ে মাথাটাকে কান-ঢাকা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে

কাঁপতে-কাঁপতে ঠিক আটটার সময় স্টেশনে এসে হাজির হলুম। আমরা মস্তবড়ো লোহার তোরঙ্গটা তুজন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বললুম, 'কেয়া হ'লো রে?'

সে বললে, 'বাবুজীর তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা তুটো একঠো ধুতি-উতি আছে, সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটা আমাদের বকশিশ ক'রে যান বাবু। আপনার কুলি ভাড়া, রেলমাশুল অনেক বেঁচে যাবে।'

আমি বললুম, 'যা যা, তোম্‌কো আর ইয়ে ক'রতে হবে না!' ব'লেই আমি হন্-হন্ ক'রে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেলুম। স্টেশন মাস্টার আমায় দেখেই বললেন, 'গুড ঈভনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভালো—আজ আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। সমস্তগাড়িটাই আপনার একলার। চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।' ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছ'টা রেল লাইন ট'পকে, অনেক দূর চ'লে চ'লে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা প'ড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাস্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বললেন, 'নিন—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।' ব'লেই তাড়াতাড়ি তাঁর বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে 'গুড নাইট' ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, রেললাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস-খস শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হ'লো—তাইতো, মাস্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন!

ইতিমধ্যে দেখি, কুলিতুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে, 'বাবুজী, পয়সা!' আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই তারাও ছুট দিলে স্টেশনের দিকে। ব্যাপার কী?

আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি, দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নিচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে শাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে স্টেশনের দিকে চ'লে গেলো। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তার-পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ—একেবারে অন্ধকার।

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিকে অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। সেই অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারদিক দেখতে লাগলুম—আশেপাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাতড়ে বিজলি-বাতির চাবি টিপলুম—খুট্‌ ক'রে শব্দ হ'লো, আলো হ'লো না। সর্বনাশ! আলো নেই নাকি? আলোর সুইচ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনোই ফল হ'লো না, যেমন অন্ধকার তেমনিই। পকেট খুঁজলুম, দেশলাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? আমি তো চুরুট খাই না—লুকিয়েও না। হয়তো তোরঙ্গের মধ্যে একটা দেশলাই আছে; চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিলো; বালাপোশ, ওভারকোট, কোট, ওয়েস্টকোট, সোয়েটার-গেঞ্জির গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতেগাছটা হারালো কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে বিদেশে বিভুঁইয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়। সেটাকেও শেষে খোয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মতো মানুষের বুককে এমন ক'রে পিষতে থাকে—এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক ক'রে ছটফট করতে লাগলুম। মনে হ'লো যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগলো—চোখের সামনে নানারকম ছায়া দেখতে লাগলুম, কানে কাদের

সব ফিস-ফিস কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠক্ ঠক্ করে সজোরে ঠুকতে লাগলুম, যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! আলোর বদলে পাথর-কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখদুটিকে ঝন্‌ঝনিয়ে দিলে।

আমি দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্টেশনের দিকে ছুট দিলুম— যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা একটা আলো নিয়ে আসবো। স্টেশন মাস্টারটা কী পাজি! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেলো, একটা আলো দিলে না! বললে কিনা দিব্যি ঘুমোতে-ঘুমোতে যাবেন? পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে স্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিলো, ঠিক তার সামনে। কিন্তু একি? এই তো সেই খেজুরগাছ; এই তো—এই তো রয়েছে; কিন্তু স্টেশন কোথায়? আমি এদিক-ওদিক চারদিক চেয়ে দেখলুম—স্টেশন নেই। মনে হ'লো, কালো স্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে স্টেশনটাকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে!

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে পথে এসেছিলুম, সেই পথে—আমার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ-ছটা লাইন টপ্‌কে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি, অত বড়ো গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কী সর্বনাশ!

আবার ভালো ক'রে চারদিকে চেয়ে দেখলুম—স্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। এখন উপায়? এই রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়? করি কী? একবার মনে হ'লো, যাই, আর-একবার গিয়ে ভালো ক'রে স্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু স্টেশনের দিকটার

সেই খাঁ-খাঁ মূর্তি মনে হ'য়ে আমার বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। ছেলেবেলায় গল্প শুনতুম, দৈত্য-দানোরা রাতারাত বড়ো-বড়ো বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো। এ কি তাই হ'লো নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হ'লো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়—আচমকা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে। যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে স'রে অন্যদিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু যেদিকে যাই সেইদিকেই লাইন! সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকে ছুটি সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই। আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হ'লো প্রাণটা যেন বাঁচলো! ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো, কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রের যেন আর শেষ নেই। ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করতে করতে আরো নিঝুম হ'য়ে আসছে। আর রাত্রের অন্ধকারটা তার কালো গায়ের উপর চামচিকের ডানার মতো একটা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ি দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব জিনিশ যেন মুছে আসছে। দেখতে দেখতে আমি-সুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতোমোজা-পরা আমার লম্বা পা-দু'খানা একটু একটু করে মুছে গেলো। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোশ-মোড়া গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে-দৃশ্য দেখতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি

চোখ বুজে ফেললুম। চোখ বুজে মনে হতে লাগলো—আমি আছি কি নেই ?—আছি কি নেই ?

'আছে আছে—এইখানে আছে', ব'লে কানের কাছে কে-একজন চিৎকার ক'রে উঠল। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয় তেমনিতরো একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইশারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে-দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর-একটা কঙ্কাল লাফাতে-লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর আর-একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে স'রে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমায় দেখতে লাগলো। তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কটকট করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই নাকি সে ?'

প্রথম কঙ্কালটা বললে, 'সে না তো কে ?'.

দ্বিতীয়টা বললে, 'বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো ? একেবারে চেনবার জো নেই !'

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বললে, 'কই দেখি ?' ব'লে তার হাড়-বার-করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে-টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

'ও আর দেখছিস কী, ও সে-ই। আমার চোখে কি ধুলো দেবার জো আছে—হাজারই লুকোক না !' ব'লে প্রথন কঙ্কালটা এতোখানি হাঁ ক'রে বিকট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই শাদা-শাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধ'রলে।

শেষ কঙ্কালটা বললে, 'তবু একটু পরখ ক'রে নেওয়া ভালো। কী জানি যদি ভুল হয় !'

প্রথম কঙ্কাল বললে, 'নে আর পরখ ক'রতে হবে না, ওদিকে লগ্ন ব'য়ে যায় !' ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম, ব্যস, এইবার আমার শেষ।

দেখতে-দেখতে বাকি দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে। প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে : তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চ্যাংদোলা ক'রে আমায় তুলে ফেললো। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুড়িটা চেপে ধ'রে ব'লে উঠলুম, 'কোথায় নিয়ে যান মশাই!'

তারা বললে, 'বিয়ে দিতে।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'বিয়ে দিতে কী মশাই!—এই বুড়ো বয়সে?'

একজন বললে, 'বুড়ো বরই আমরা পছন্দ করি।'

আমি বললুম, 'মশাই, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না। আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন?'

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'তুমি ভেবেছো, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।'

আমি বললুম, 'আমি তো মশাই পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই! সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।'

সে বললে, 'আমরাও পুলিশ এসেছি, ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।'

আমি কাঁচুমাচু হ'য়ে বললুম, 'কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে পারবো না।'

'পারবে না কী? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কী তোমার গোঁ?' ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠলো।

আমি বললুম, 'রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি পাত্র নেই! কত ছেলে তো খুশি হ'য়ে বিয়ে করবে!'

সে বললে, 'এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথা? যার-তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না? চলো, লগ্ন ব'য়ে যায়।'

আমি কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললুম, 'তাহ'লে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে ?'

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বললে, 'দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা ?'

আমি তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'ক্যাংলা কে মশাই ! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্তী।'

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, 'রাধে মাধব। রাধে মাধব !'

আমি বললুম, 'সে কী মশাই ?'

সে বললে, 'এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শেয়াল-কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্তী আছে ? তুই এতোই বোকা পেলি আমাদের ?'

আমি বললুম, 'এই তো আমি রয়েছি।'

সে বললে, 'আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর থেকে কথা বললেই কি তুই মাধব চক্রবর্তী হয়ে যাবি ?'

আমি বললুম, 'সে কী মশাই। মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো ?'

সে বললে, 'আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁদিয়ে আছিস সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস ?'

আমি বললুম, 'এসব কী হেঁয়ালি বকছেন মশাই ? মাধব চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্তী গেলো কোথায় ?'

সে বললে, 'আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।'

আমি বললুম, 'না ম'রেই সে বৈকুণ্ঠে গেল ?'

সে বললে, 'মরেছে না তো কী ?'

আমি বললুম, 'মরেছে কী রকম। সে ম'রে গেল আর টের পেলে না ?'

সে বললে, 'মানুষ কখন জন্মায় কখন মরে, সে তা টের পায় নাকি ?'

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেলো। আমার অজান্তে আমি ম'রে গেলুম নাকি—অ্যাঁ ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু নাকি ? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হ'তে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতোক্ষণ কথা কইতে পারতুম ? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে ? কিন্তু মারা গেলুম কেমন ক'রে ? আমার তো রোগ হয় নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি !

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এরা ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতে আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের বুঝি এখনো চলছে। কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে ? আমি যদি কাঙালীচরণ হবো, তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন ? এরা তো চিনতে পেরেছে !

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো, 'কী হে ক্যাংলা, কী ভাবছো ? বিয়ে করবার মতি স্থির হ'লো ?'

আমি বললুম, 'আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যিই কাঙালীচরণ ?'

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, 'সে কী রে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস না ?'

আমি বললুম, 'না।'

সে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে। তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না ?'

আমি বললুম, 'একটুও না।'

সে বললে, 'তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে ?'

আমি বললুম, 'কই, আমার তো কোনো বিয়ের কথা হয় নি!'

সে বললে, সে কী রে! তোর গায়ে-গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না ?'

আমি বললুম, 'গায়ে-গোবর কাকে বলে ?'

সে বললে, 'তুই অবাক করলি! তোর কিছু মনে পড়ছে না ? গায়ে-গোবরের দিন ভোররাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালপুকুরের মাথায় ব'সে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী বর-পণের কড়ি বাছছিল; তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পাস নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি রাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক ক'রে লেগে গেলো। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাতহাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়! আর তুই বাড়িতে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে বললি, "ও মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না।" "কেন রে, কেন, কী হয়েছে ?" তুই বললি, "ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে।" "তাতে হয়েছে কী ?" তুই বললি, "হয়েছে আমার মাথা মুণ্ডু!" ব'লে কপাল চাপড়াতে লাগলি। এ-সব তোর মনে পড়ছে না ?'

আমি বললুম, 'মনে পড়ছে, এইরকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কী হ'লো ?'

সে বললে, 'সর্বনাশ করলি! তারপরও তোর মনে পড়ছে না ? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধেন দিলেন যে, রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত একে সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁতলে দে, তাহ'লেই সব দোষ খ'ণ্ডে যাবে।—তুই বললি, "ওরে বাপ রে, রাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা—সে আমি পারবো না"; ব'লে তুই ছুট দিলি।'

আমি বললুম, 'তারপর?'

সে বললে, 'তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্তীর মড়াটাকে দানো পাইয়ে ব'সে আছিস।—হ্যাঁরে, এই মাধব চক্রবর্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেলো কোথায়? তোকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে বুঝি?'

আমি বললুম, 'মাধব চক্রবর্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সে বললে, 'তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস?'

আমি বললুম, 'তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।'

সে বললে, 'তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে।'

আমি বললুম, 'মানুষে পেয়েছে কী গো?'

সে বললে, 'জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষেও তেমনি আমাদের কারো-কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্তীর দেহে সেঁদিয়েছিলি, তখন বোধহয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।'

আমি বললুম, 'তাতে কী হয়?'

সে বললে, 'মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল-তাবোল বকে, কটমট ক'রে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।'

আমি বললুম, 'ও, তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা ব'লে চিনতে পারছি না। ওগো, তবে আমার কী হবে।'

সে বললে, 'যেমন বিয়ে করবো না ব'লে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ!'

আমি বললুম, 'ওগো, আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।'

সে বললে, 'তবে বেরিয়ে আয়—ওখান থেকে।'

আমি বললুম, 'বেরুবো কী ক'রে গো।'

সে বললে, 'পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুশকিল করলি দেখছি। এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়্—তাহ'লেই শুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।'

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, 'ওরে বাপ্‌রে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারবো না।'

সে বললে, 'ভয় কী! আমি তো কতোবার ফাঁসি গেছি। তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়্।'

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম, 'না গো না—সে আমি পারবো না। গলায় ফাঁস দিতে কিছুতেই পারবো না।'

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মতো চোখদুটোকে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরিয়ে বললে, 'কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দ'ড়ে, তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন কথা বলছিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'কী করবো, আমার যে ভয় করছে!'

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে-করতে ব'লে উঠলো, 'এইবেলা ঝুলে পড়্, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি!'

আমি বললুম, 'ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারবো না—আমার ভয় করছে!'

সে আরো রেগে বললে, 'হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ' ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে,'রাগ করেন কেন খুড়োমশাই! ও হয়তো ক্যাংলা নয়। নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?'

খুড়োমশাই বললেন, 'কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিকটিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড়ো-বড়ো ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে?'

শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কী দাদামশাই?'

দাদামশাই বললেন, 'আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা হোক।' ব'লে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কী হে, তুমি মাধব চক্রবর্তী, না কাঙালীচরণ?'

আমি বললুম, 'আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু তার পর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।'

সে বললে, 'কাঙালীচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছো ব'লে তোমায় শাস্তি নিতে হবে—তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে।'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, আমি তবে মাধব চক্রবর্তী।'

সে বললে, 'বেশ, মাধব চক্রবর্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পারো, তাহ'লে তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চ'লে যাবো।'

'আর যদি না পারি?'

'তাহ'লে এখানে তোমার ঘাড় মটকে রেখে চ'লে যাবো।'

'ঘাড় মটকে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্তিরে নিজেকে কী ক'রে প্রমাণ ক'রবো মশাই?'

'না পারো, ঘাড়টি মটকে দেবো—শ্মশানের ভূত হ'য়ে থেকো।'

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'কাঁদছো কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয় তুমি মাধব চক্রবর্তী?'

আমি বললুম, 'আছে। এই দেখুন, আমার ডান হাতে একটা জড়ুলের দাগ।'

সে হেসে বললে, 'ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোনো ভিতরের প্রমাণ দিতে পারো ?'

আমি বললুম, 'আমার ভিতরে কী আছে না আছে, আমি তো তা জানি না মশাই! এই দেখুন না, আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে, কি মাধব চক্রবর্তী আছে, আমি তা-ই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।'

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে ব'লে উঠলো, 'কাঙালীচরণ হ'লে তোমায় ফাঁসি দেবো কিন্তু।'

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম, 'আজ্ঞে না না, আমি মাধব চক্রবর্তী।'

সে বললে, 'শিগগির প্রমাণ করো, নইলে ঘাড় মটকালুম ব'লে।'

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বললে, 'অমন ঘেবড়ে যাচ্ছো কেন? তোমার কি এমন কোনো গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী ?'

আমি ব'লে উঠলুম, 'হ্যাঁ, আছে বৈকি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি!'

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'তুমি কবিতা লিখতে পারো? নিজে লেখো? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও ?'

আমি বললুম, 'না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।'

সে বললে, 'তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয় ?'

আমি বললুম, 'না, সম্পাদকেরা ভয়ে ছাপেন না।'

সে বললে, 'ভয়ে ছাপেন না কীরকম ?'

আমি বললুম, 'আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে-কবিতা ছাপলে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তে চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ-কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।'

সে বললে, 'আচ্ছা! কই দেখি, একটা কবিতা লেখো দেখি!'

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট-বইখানা বার ক'রে বললুম, 'আলো একটা চাই যে!'

সে বললে, 'দিচ্ছি আলো।' ব'লে খানিকটা ধুলোবালি একত্র ক'রে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্ব'লে উঠলো। আমি সেই আলোয় ব'সে লিখতে লাগলুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বললে, 'কই, কী লিখলে পড়ো।'

আমি বললুম, 'এখনো যে শেষ হয়নি মশাই!'

সে বললে, 'কবিতার আবার শেষ আছে নাকি? যা লিখেছো পড়ো—ফাজলামো করতে হবে না।'

আমি সুর ক'রে পড়লুম—

'পড়িয়ে বিপদে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা!
উদ্ধারো এ দুঃখকারা-
গার হ'তে মা জননী!
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-চাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখি,
শূন্য হেরি এ-ধরণী!
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা
দিয়ে তোর পা-তরণী!'

এটুকু শেষ হ'তেই সে বললে, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে! এরকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা, না পুরোনো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ?'

আমি বললুম, 'না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাটকা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।'

সে বললে, 'থামো, তোমার আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি ক'রে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভাবছো? তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড়ো ওস্তাদ। আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পারো?'

আমি বললুম, 'খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে আমি প্রাইজ পেয়েছিলুম। আপনার নামটা কী বলুন, আমি এখনই লিখে দিচ্ছি।'

সে বললে, 'আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেলো দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্‌ ক'রে। বুঝবো কত বড়ো বাহাদুর তুমি।'

আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বললে, 'কী লিখলে পড়ো হে। আমি ও বড়ো কবিতা দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

আমি বললুম, 'মশাই আর-একটু সময় দিন।' ব'লে আমি খস্‌-খস্‌ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বললে, 'উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়ো।'

অগত্যা আমি পড়লুম—

'রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কদ্‌বেল;
পাশ আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল;
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সারখেল,
সব-সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল, জাঁদরেল।'

পড়া শেষ হ'তেই সে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছো তো হে! আর-একবার পড়ো তো, আর-একবার পড়ো তো!'

আমি আর-একবার চিৎকার ক'রে পড়লুম—রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি। সে আবার বললে, 'চমৎকার হয়েছে! যাও, প্রমাণ হ'য়ে গেলো, তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী।'

আমি বললুম, 'ঠিক বলছেন মশাই? আমি কাঙালীচরণ নই?'

সে বললে, 'কাঙালীচরণের চোদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?'

আমি বললুম, 'মশাই, আমার আর-একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের শীত সম্বন্ধে।'

সে বললে, 'কই শোনাও তো দেখি!'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট-বইয়ের পাতা হাতড়ে কবিতাটা বার ক'রে পড়তে শুরু করলুম—

'বস্তা-বস্তা পুঞ্জ-পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বালাপোশ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
ঊর্ধ্বফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে, কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল।
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোড়ে শার্প নেল—'

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো,—'ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে!'

আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি, আমার সামনের কঙ্কাল-তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি 'রাম! রাম!' বলতে বলতে সেখান

থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম-নামটা যে কেন মনে আসেনি কে জানে? আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বললে, 'বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

আমি আর কী বলবো? বললুম, 'আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কিনা, তাই একটু দেখছিলুম।'

তারা বললে, 'আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিই।' ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে উঠে বললুম, 'হ্যাঁরে, গাড়িতে আলো নেই কেন?'

সে বললে, 'বিজলি বাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।'

আমি বললুম, 'আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস?—বকশিশ দেবো।'

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

পুরোনো সব বাড়ি ভেঙে যে নতুন রাস্তাটা হচ্ছে, তার একদিকে লাল শাদা হলদে নানা রঙের নতুন বড়ো-বড়ো বাড়ি, আর একদিকে ইঁট-বের-করা বালি-খসা ভাঙা পুরোনো বাড়ির সারি। নতুন বাড়িগুলির মধ্যে একখানা খুব সুন্দর, লাল ইঁটে গড়া, মাথায় শাদা গম্বুজ। এই বাড়িতে থাকে সাত বছরের মেয়ে শোভনা। শোভনার বাবা কয়লার ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা জমিয়েছেন। শোভনা তাঁর এক মা-হারা মেয়ে, সে সমস্ত বাড়ির উপর রাজত্ব করে—দরোয়ান খানসামা চাকর থেকে মিনি-বেড়াল, বিলি-কুকুর লিলি, সবাই তার হুকুমে চলে, তার ভয়ে জড়োসড়ো, তার মন একটু পেলে ভারি খুশি।

এই বাড়ির ঠিক সামনে ওদিকের ফুটপাথে একটি কালো ভাঙা বাড়ি, তার ছাত নুয়ে পড়েছে, চুন বালি সব খ'সে প'ড়ে ইঁট দেখা যাচ্ছে। সেই পুরোনো বাড়িতে থাকে আট বছরের ছেলে প্রভাত। ভাঙা বাড়িতে প্রভাতের বাবার এক খাবারের দোকান। প্রভাত দোকানের সব দেখাশুনো করে।

প্রভাত প্রায়ই ময়লা ছেঁড়া জামা প'রে খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে শোভনাদের বড়ো বাড়ির সামনে দিয়ে যায়। দূর থেকে প্রভাতকে আসতে দেখলেই শোভনা জানলার আড়ালে লুকোয়, আর প্রভাত অবাক হ'য়ে লাল বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। কোনোদিন প্রভাত অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে শোভনা দুষ্টুমি ক'রে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে; শোভনার দিকে চাইতেই প্রভাতের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তারপরেই সে লজ্জায় ছুটে পালায়।

শোভনা ঠিক বুঝতে পারে না প্রভাত কোন্ ঘরটার দিকে চেয়ে থাকে : তার ঘরের জানলার দিকে, না তার ঘরের পাশে যে খাবার-ঘরে বিস্কুট কেক মাখন সব সাজানো সেই ঘরটার দিকে। তার ভারি ইচ্ছে প্রভাতকে ডাকে, কিন্তু ডাকতে পারে না, ডাকলেই প্রভাত ছুটে পালাবে, কিছুতেই আসবে না।

কিছুদিন হ'লো শোভনার ভারি অসুখ। এখন ডাক্তারবাবু থেকে আয়া পর্যন্ত সবাই তার উপর হুকুম চালায়, ঘর থেকে বাহির হওয়া বন্ধ ; চানাচুর ঘুগনিদানা কিছু কেনবার জো নেই।

রাস্তার দিকে ক্লান্ত করুণ নয়নে তাকিয়ে শোভনা বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিল। পথ দিয়ে স্কুলের ছেলের দল হল্লা ক'রে চ'লে গেল। প্রভাত দোকানে ব'সে গরম কচুরি জিলিপি ভাজছিল। শোভনার জন্যে তার বাবা কত বিস্কুট লজেনচুস এনে দিয়েছেন, সে রাগ ক'রে কিছুই খায়নি। সামনের দোকানের সাজানো খাবারগুলোর দিকে সে চেয়ে রইল। সেগুলি যে ঠিক খেতে ইচ্ছে করছিল তা নয়, কারণ অসুখে তার মোটেই খিদে ছিল না। সে ভাবছিল খাবারগুলো যদি চলতে, কথা কইতে পারতো, তবে সে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব করতো। একা তার মোটেই ভালো লাগছিল না।

তখন দুপুর। বাইরে রোদের তেজ বেড়ে উঠেছে। চাকর এসে সামনের জানলা বন্ধ ক'রে দিল। শোভনার ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ খাবারের দোকানের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু এখন অসুখ, তার হুকুম কেউ শুনবে না, রাগ ক'রে সে চোখ বুজোলে।

ভালো লাগে না সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে,—সবার অলক্ষ্যে শোভনা বাড়ি ছেড়ে ছুটে বাইরে এল। গেট পেরিয়ে সেই খাবারের দোকানের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ মাঝপথে যেতেই কী ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হ'লো, পথটা ভেঙে খ'সে গেল ; ভয়ে সে চোখ বুজে রইল।

চোখ মেলে চাইতেই দেখে, বাঃ। কী সুন্দর জায়গায় এসে হাজির

হয়েছে, এ কী আশ্চর্য দেশ! পাশ দিয়ে শাদা এক নদী ব'য়ে চলেছে, নদীর জলে চাঁদের আলো হিরের মতো ঝকমক করছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না সে কখনো দেখেনি। সামনে রুপোর শাদা নগরের দেওয়াল, কিন্তু কোথাও কেউ নেই। কী করবে ভাবছে, এমন সময় দেখে এক মস্ত বড়ো শাদা বল গড়িয়ে-গড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে, যেন একটা মস্ত বড়ো কামানের গোলা তাকে মারতে ছুটে আসছে। শোভনার ভারি ভয় হ'লো, নদীর তীর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে, গোলাটাও তার পেছনে-পেছনে ছুটে আসতে-আসতে চেঁচিয়ে বললো, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভয় নেই! ভয় নেই!'

কিছুদূর ছুটে হাঁপিয়ে প'ড়ে যখন শোভনা দাঁড়ালো, দেখে গোলাটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছে। সোনালি গোলাটাকে হাসতে দেখে শোভনার ভারি আমোদ হ'লো, সে বললে,—'কে তুমি?' বিকট হেসে গোলা বললে,—'আমায় চিনতে পারছো না? আমি যে রসগোল্লা!' তার হাসির চোটে অনেকখানি রস ছিটকে এসে শোভনার সুন্দর ফিরোজা রঙের জামাটা মাটি ক'রে দিলে। আশ্চর্য হ'য়ে শোভনা বললে,—'রসগোল্লা? এত বড়ো! তুমি কোন্ দোকানের রসগোল্লা? বাগবাজারের, না বউবাজারের, না—?' তাকে বাধা দিয়ে রসগোল্লা বললে,—'দেখছো না, তুমি আর মানুষের দেশে নেই, এ খাবারের দেশে এসে পড়েছো,—ওই দেখ, পাশ দিয়ে দুধের নদী ব'য়ে চলেছে, আর তুমি মাটিতে ধুলোর উপর দাঁড়িয়ে নেই, তোমাদের নদীর ধারে যেমন বালি আমাদের নদীর ধারে তেমনি চিনি।'

পথে হাত দিয়ে শোভনা দেখে, তাইতো, এ তো ধুলো নয়, এ সব চিনি! সে আগে খেয়ালই করেনি।

রসগোল্লা বললে,—'তোমাকে দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। অনেকদিন আমাদের দেশে কোনো ছেলেমেয়ে আসেনি। যারা আমাদের খায়নি, অথচ খুব ভালোবাসে, তারাই আমাদের দেশে আসতে পারে। এসে তোমার ভারি অদ্ভুত ঠেকছে বটে!'

ছুটে ছুটে শোভনার বড়ো তেষ্টা পেয়েছিল। রসগোল্লা বললে,—'ওই নদীতে নেমে একটু দুধ খেয়ে নাও।'

আঃ, কী মিষ্টি, কী ঠাণ্ডা সে দুধ, যেন অমৃত! রসগোল্লা তার গা থেকে খানিকটা ভেঙে শোভনাকে খেতে দিলে। এমন মিষ্টি জিনিশ সে কখনো খায়নি।

খাওয়া শেষ হ'লে শোভনা বললে,—'তোমাদের দেশ দেখবো।'

রসগোল্লা গা থেকে যা ভেঙে দিয়েছিল তা তখনি আপনা-আপনি ভ'রে গেল। সে পেট ফুলিয়ে হেসে বললে,—'এগিয়ে চলো।'

ছানার তৈরি শহরের দেওয়ালের কাছে এসে রসগোল্লা সজোরে এক ধাক্কা দিলে, একটা ফুটো হ'য়ে গেল। তার ভিতর দিয়ে শোভনা ও সে ঢুকতেই ফুটো আপনি বুজে গেল।

শহরে প্রবেশ ক'রেই শোভনা অবাক। বাঃ! কী আশ্চর্য অদ্ভুত জায়গা! আমাদের মতো সেখানকার পথ মাটির নয়, সব ময়দার, রাস্তায় ধুলো নেই, সব ময়দার গুঁড়ো। আমাদের যেমন সিমেন্ট দিয়ে ফুটপাথ বাঁধানো, সেখানে তেমনি শক্ত ছানা দিয়ে পথ বাঁধানো, আলোর মতো শাদা পথের দুধারে বড়ো-বড়ো ছানার বাড়ি রুপোর মতো ঝকমক করছে। কোনো-কোনো বড়োলোক আবার ক্ষীরের বাড়িও করেছে। মাঝে-মাঝে দুধের দয়ের ক্ষীরের পুকুর। কতো রকমের খাবারে রাস্তায় কী ভিড়! শোভনা ঢুকতেই কতকগুলো খাবার তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। লাল-পাগড়িওয়ালা পান্তুয়া হচ্ছে শহরের পুলিশ, সে হেসে বললে,—'শোভনা, সেলাম।' একদল গজা একদল বোঁদের সঙ্গে কি-একটা তর্ক করতে যাচ্ছিল, শোভনাকে দেখে তাদের তর্ক থামিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো, বললে,—'তুমি এসেছো, ভারি খুশি হলুম।'

রসগোল্লা শোভনাকে রাজপুরীর দিকে নিয়ে চললো। এ দেশের রাজা হচ্ছেন সন্দেশ, এখন 'আবার-খাবো' সন্দেশ-বংশে রাজত্ব করছেন। রসগোল্লা তাঁর সেনাপতি, কেননা যুদ্ধ করতে, জোরে ছুটে গিয়ে ঢুঁ মারতে তার মতো কেউ পারেনা। সাড়ে সাতপাক-ওয়ালা জিলিপির

বুদ্ধি নাকি ভারি প্যাঁচালো, তাই সে রাজার মন্ত্রী হ'য়ে আপন খেয়ালমতো মন্ত্রণা দেয়।

গজা-পাড়া বোঁদে-পাড়া পেরিয়ে তারা দু'জনে এক মস্ত লবণের মাঠে এসে উপস্থিত হ'লো, একদিকে তেলের একটা দিঘি, আর একদিকে ছানার পাহাড়। এখানে এক মস্ত সভা হচ্ছে। শোভনা বললে,—'এত হৈ-চৈ কিসের!'

রসগোল্লা বললে,—'ওরা সব ছোটো জাত, কি সভা করছে।'

আশ্চর্য হ'য়ে শোভনা বললে,—'খাবারদের ভেতর আবার জাত আছে নাকি?'

রসগোল্লা বললে,—'হ্যাঁ আছে বৈকি। এই কচুরি শিঙাড়া নিমকি ওই সব। ওরা আমাদের ঘর তৈরি করে, পথ সাফ রাখে, খাবারের জোগাড় করে।'

শোভনা জিজ্ঞেস করলে,—'ওরা এখন জটলা বেঁধে কী করছে?'

রসগোল্লা বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে বললে,—'ওদের সভা হচ্ছে!'

তাদের বক্তৃতা শুনতে শোভনার ভারি ইচ্ছে হ'লো। সভার কাছে আসতেই শোভনা দেখলে, হাজার-হাজার কচুরি শিঙাড়া লবণের মাঠে ব'সে গেছে। ছানার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে লম্বা ছিপছিপে এক নিমকি তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে খুব বক্তৃতা দিচ্ছে,—'কচুরি-শিঙাড়া-নিমকি ভাইগণ, আমরা আর সন্দেশ-রাজার প্রভুত্ব মানবো না, এসো আমরা ধর্মঘট করি!' আর সবাই হাততালি দিয়ে সমস্বরে বলছে,—'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' সবাই এমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছে দেখে শোভনার ভারি ভয় হ'লো। সে রসগোল্লাকে বললে,—'সত্যি যদি ওরা তোমাদের মেরে ফেলে!'

রসগোল্লা হেসে বললে,—'পাগল! এক্ষুনি একদল পান্তুয়া পাঠিয়ে দিলে মারের চোটে সবাই চুপ ক'রে মুখ বুজে কাজে লেগে যাবে।'

শোভনাকে নিয়ে রসগোল্লা রাজবাড়িতে এসে পৌঁছলো। সোনার মতো রাঙা ক্ষীরের তৈরি রাজবাড়ি, তাতে হিরে- মানিকের মতো কত

লাল-নীল পেস্তাবাদাম বসানো, চাঁদের আলোয় কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল! শ্বেতপাথরের মতো শাদা ছানার থামওয়ালা বড়ো সভায় ক্ষীর মাখনের সিংহাসনে সন্দেশ-মহারাজ মাথায় সরের মুকুট প'রে ব'সে আছেন। পাশে লাল রঙের সাজ প'রে জিলিপি মন্ত্রী ব'সে। সভার ডানদিকে অন্য সব রাজ্যের প্রতিনিধিরা—ফলের রাজ্য থেকে এসেছে পাকা আম রসিক বুড়োর মতো, লাল কমলালেবু যেন ভোরবেলার সুর্যি, কপি একগাদা সবুজ চোগাচাপগান প'রে খুব মোটা হ'য়ে ব'সে আছে, নীল তরমুজ, সবুজ ডাব আসর জমিয়ে রেখেছে। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল ফুলের দেশের প্রতিনিধিদের—রক্তগোলাপ, রক্তপদ্ম, শুভ্র বেলা, হাস্নাহানা সবাই সভার এক কোণ আলো ক'রে বসে ছিল।

শোভনা ঢুকে সন্দেশরাজকে প্রণাম করতে তিনি তাকে বসতে বললেন। এক ক্ষীরমোহন এসে হাত ধ'রে তাকে মাখনের নরম গদিতে বসিয়ে দিলে। শোভনা বসতেই দেখে, চিনির লাল-নীল অলংকার-পরা এক হলদে বিস্কুট সাইকেলের চাকার মতো গড়াতে-গড়াতে এসে তাকে ডাকছে,—'শোভনা, আমায় চিনতে পারছো না? আমি কেকরাজ্যের প্রতিনিধিরূপে এসেছি।'

রাজা এতক্ষণ সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেনাপতিকে দেখে বললেন,—'আমি তো বলি যুদ্ধ!'

রসগোল্লা আশ্চর্য হ'য়ে বললে,—'কিসের যুদ্ধ মহারাজ?'

সন্দেশরাজ গলা চড়া ক'রে বললে,—'জানো না, আমার দূত দরবেশকে কেকরাজ অপমান ক'রে পাঠিয়েছে!'

দরবেশ তার পাকা দাড়ি নেড়ে ব'লে উঠলো,—'শুধু অপমান মহারাজ, চপ সেনাপতি বলেছে এবার রসগোল্লাকে দেখে নেবো, সে কত যুদ্ধ করে!'

শোভনা ধীরে বিস্কুটকে জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাপার কী?'

বিস্কুট গম্ভীরভাবে বললে,—'ব্যাপারটা গুরুতরই, আমাদের দেশের

সঙ্গে এদের লড়াই বাধাবার চেষ্টা হচ্ছে। ঐ শাদা দুধের নদীটা দেখছো, তার ওপারে আমাদের দেশ। আমাদের প্লামকেক রাজবংশের সঙ্গে এ-দেশের সন্দেশ রাজবংশের বংশানুক্রমে শত্রুতা। এ-রাজার কোনো পিতৃপুরুষ ও-রাজ্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়, আমাদের দেশের রাজা রাজি হলেন না। লাগাও যুদ্ধ! সে-যুদ্ধ তিন পুরুষ চলে। ঐ যে দুধের নদীটা দেখছো, তার অর্ধেক এ-রাজার, অর্ধেক আমাদের রাজার। এখন, নদীর মাঝখানটা যে ঠিক কোথায়, তার আর মীমাংসা হ'লো না। তাই নিয়ে দু-পুরুষ যুদ্ধ চললো। এ-যুদ্ধে একলাখ কচুরি, দু-লাখ শিঙাড়া-নিমকি, পাঁচ লাখ চপ-কাটলেট মরেছিল। এখন এ-রাজার আবার যুদ্ধ করবার শখ হয়েছে। আসল কী জানো, ঐ যে জিলিপি মন্ত্রীটিকে দেখছো, ওঁর বুদ্ধি যেমন প্যাঁচালো, লোকটিও তেমনি। ওঁর মতলব, এই কড়া রাজাকে সরিয়ে নতুন রাজবংশ বসিয়ে আপনিই রাজত্ব করেন। অবশ্য আরো কারণ আছে, কেকের এক সুন্দরী বোন আছেন, পুডিং : তাঁকে উনি বিয়ে করবেন ব'লে দরবেশকে ঘটকালি করতে পাঠিয়েছিলেন। তারা দরবেশকে যে খেয়ে ফেলেনি এই ভাগ্যি। আরো কি জানো, আমাদের দেশে অনেক কফির সরোবর, ডিমের কুসুমের পুকুর, জ্যাম-জেলির ছোটো-ছোটো নদী আছে,—খালি ক্ষীর দই ছানা খেয়ে এদের অরুচি হ'য়ে গেছে, নতুন খাবার চাই—।'

রাজা মাথার মুকুট নেড়ে বললেন,—'তাহ'লে মন্ত্রী, কী বলো?'

জিলিপি কথা পাকিয়ে-পাকিয়ে বললে,—'মহারাজের যা আদেশ। আমরা তো আজ্ঞা-পালনকারী ভৃত্য মাত্র।'

সহসা সভার দ্বারে এক ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। একদল ক্ষিপ্তপ্রায় কচুরি-শিঙাড়া-নিমকি যেন গরম খোলা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে ছুটে সভার মাঝে দাঁড়ালো।

মহারাজ রক্তনেত্রে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—'কে তোমরা?'

—'আমরা মহারাজের দীন প্রজা।'

জিলিপি মুচকে হেসে বললে,—'তোমরা না বিদ্রোহ ক'রে মহারাজের মুণ্ড কাটবে?'

সন্দেশরাজ ক্রুদ্ধ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে,—'তোমরা কী চাও?'

—'আমরা সমান অধিকার চাই। আমরা তেলের ডোবায় স্নান করি, কেন ঘিয়ের পুকুরে নামলে জেলে যেতে হবে? আমাদের গ্রামের পথে কেবল লবণ, আর রসগোল্লা-পান্তুয়া পাড়ায় চিনি। কেন এ প্রভেদ? আমরাও খাবার, তারাও খাবার!'

রাজা মুচকে হেসে বললেন,—'সে হবে পরে। এখন কেকরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, চলো।'

কচুরি-দলপতি লাফিয়ে বললে,—'মহারাজ, আর আমরা যুদ্ধ করবো না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা অকারণে রাজাদের খেয়াল মেটাতে যুদ্ধ ক'রে মরেছে, আর আমরা ভুলছি না।'

রাজা একটু ভীত হ'য়ে মন্ত্রীর দিকে চাইলেন।

জিলিপি তার লাল পোশাক ফুলিয়ে বাঁকা-বাঁকা কথায় বলতে লাগলো,—'আরে মুর্খের দল, এ যুদ্ধ কি তোদের স্বার্থের জন্য, তোদের সুখ-বৃদ্ধির জন্য নয়? তোদের মঙ্গল ভেবে আমার চুল পেকে গেল, আর তোরা কী অকৃতজ্ঞ! সাধে কি তোদের ছোটো জাত বলে? এ যুদ্ধে যদি জয়ী হই তবে কেক-চপের দেশে যত মাংসের পাহাড়, যত চর্বির পুকুর সে-সব কাদের হবে? তোদের হবে বোকা—'

নতুন খাবার লাভের আশায় সবাই জয়ধ্বনি ক'রে বললে,—'যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ।'

কেক ও বিস্কুট-প্রতিনিধি যুদ্ধ-ঘোষণার বার্তা নিয়ে তাদের দেশের দিকে ছুটলো। চারিদিকে লাফালাফি চেঁচামেচি প'ড়ে গেলো। কচুরি শিঙাড়া নিমকি গজা বোঁদে পান্তুয়া সবাই নেচে সেই ক্ষীরে গড়া সভাকে ভেঙে ফেলে আর-কি। শুধু রসগোল্লা চুপে-চুপে শোভনাকে নিয়ে যুদ্ধের মন্ত্রণাগার থেকে চ'লে গেলো।

যে দুধের নদীতীরে রসগোল্লার সঙ্গে শোভনার দেখা হয়, তার

পরপারে কেকরাজার দেশ। তখন প্লামকেক-রাজবংশ সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব করছিলেন। এ দেশের পথ ময়দার বটে, তবে তার সঙ্গে প্রায়ই মাংস মেশানো; আমাদের পথে যেমন মাঠির সঙ্গে খোয়া ভরা। বাড়িগুলো প্রায়ই শক্ত লাল মাংসের। মাঝে-মাঝে চায়ের, কফির পুকুর। তখন সে-রাজ্যে খুব নাচ-গান হচ্ছে। চপের হাত ধ'রে মিস্ পুডিং, কাটলেটের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বিস্কুট, মিস্টার পাউরুটির সঙ্গে মিস্ প্লামকেক নাচতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। কোকোর দিঘির ধারে কত রকমের কেক পুডিং বেড়াচ্ছে, গল্প করছে। হঠাৎ একটা বাঁশি বেজে উঠলো, নাচ-গান সব থেমে গেলো, সবাই বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে এলো—যুদ্ধের ডাক এসেছে।

মুহূর্তের মধ্যে পথে-পথে দলে-দলে সেনা দাঁড়িয়ে গেলো। কেক-পাড়া থেকে দশ হাজার কেক বেরিয়ে এলো; চপ-নগর থেকে বিশ হাজার কালো-কালো চপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এলো। কাটলেট-গাঁ থেকে পঁচিশ হাজার কাটলেট চাকার মতো ঘুরতে-ঘুরতে বেরিয়ে এলো।

দুধের নদীর দুই ধারে দুই দেশের সেনাদল এসে গর্জন করতে লাগলো। পান্তুয়া বললে,—'আজ সব কেকবংশ ধ্বংস করবো!'

চপ অমনি গর্জন ক'রে বললে,—'খবরদার! রসগোল্লাকে দেখে নেবো, চ'লে আয়!'

একহাজার রসগোল্লা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারা কিছুতেই ডোবে না। এপার হ'তে ওপার সারি বেঁধে শুয়ে তারা এক মস্ত সাঁকো বেঁধে ফেললে। সেই পোলের উপর দিয়ে দশ হাজার কচুরি বিশ হাজার শিঙাড়া ত্রিশ হাজার নিমকি পঞ্চাশ হাজার গজা মার্চ করতে-করতে ওপারে গিয়ে উঠলো। ওদিকে কালো কালো দৈত্যের মতো হাজার-হাজার চপ-কাটলেট সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে; কচুরি-শিঙাড়া বাহিনী তীরে উঠতেই তারা তাদের ঠেলে নদীতে জলে ফেলে দিতে লাগলো। তাদের রাশ-রাশ দেহে নদী বুজে যায় আর-কি! তখন শোভনা এক পরামর্শ দিলে। এ-দিকের যুদ্ধটা চলুক, আর কিছুদূর গিয়ে একদল

সেনা শত্রুপক্ষের অলক্ষ্যে নদী পার হোক, তারপর হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ ক'রে সবাইকে ঠেলে নদীতে ফেললেই হবে। রসগোল্লা সেনাপতি পরামর্শটা ভালো ভেবে তাই করলে। এদিকে যখন নিমকির সঙ্গে বিস্কুটের খুব যুদ্ধ চলেছে, খন্-খন্ আওয়াজ হচ্ছে, শিঙাড়া তার তিন ধারালো শিং দিয়ে প্যাটিগুলোকে গুঁতোতে শুরু করেছে, কচুরির দল কাটলেটের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে খুব লড়াই বাধিয়েছে আর লাল লম্বা পান্তুয়ারা কেকবংশ ধ্বংস করবার জন্য উদ্যত হ'য়ে উঠেছে,—হঠাৎ পেছন থেকে দমদম বুলেটের মতো বোঁদে-বাহিনী এসে আক্রমণ করলে। ব্যাপার গুরুতর, লজেনচুস ব্রিগেডের ডাক হ'লো।

অমনি লাল নীল হলদে কতরকমের লজেনচুস বন্দুকের গুলির মতো আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে কচুরি-শিঙাড়ার পেট ছ্যাঁদা ক'রে সবাইয়ের দেহে হুলের মতো বিঁধতে লাগলো। যুদ্ধটা এতক্ষণে জ'মে উঠলো।

যুদ্ধে দু-পক্ষেরই হাজার-হাজার খাবার মরছে দেখে শোভনার ভারি দুঃখ। সে তাড়াতাড়ি রসগোল্লা-পোল দিয়ে নদী পার হ'লো। কী ক'রে যুদ্ধ থামানো যায় ভাবছে, দেখে সামনে সেই দোকানের ছেলেটি দাঁড়িয়ে হাসছে। প্রভাত শোভনার দিকে চেয়ে ব'লে উঠলো,—'যুদ্ধ থামাও।'

শোভনার অনুরোধে দু-পক্ষ যুদ্ধ থামিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। শুধু সন্দেশ রাজবংশের কয়েকজন সন্দেশ প্রতিবাদ করলে,—'কেন যুদ্ধ থামাবো! মরি আর জিতি, চালাও, যুদ্ধ চালাও!'

শোভনা কী বলবে ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। প্রভাত হেসে বললে,—'আচ্ছা, কিসের জন্য যুদ্ধ, কিসের জন্য সব যুদ্ধ করছো? কচুরির সঙ্গে কাটলেটের, নিমকির সঙ্গে বিস্কুটের কি ঝগড়া কি শত্রুতা আছে? কিছুই না। কেন মিছিমিছি এমন ক'রে সব মরবে?'

সবাই ভাবলে, তাইতো! যুদ্ধের কারণ যে কী, তা কেউ জানে না। নিমকি ঠেলে শিঙাড়াকে, শিঙাড়া ঠেলে গজাকে, গজা বোঁদেকে ঠেলে বলে, 'কী, যুদ্ধের কারণটা কী?' প্যাটি জিজ্ঞাসা করে

চপকে, চপ কাটলেটের গা ঠেলে বলে, 'বাস্তবিক, কিসের জন্য এত মারামারি, এত ঝগড়া ?'

কেকরাজের আত্মীয়-বন্ধুরা দেখলে, বেগতিক। একখানা প্লামকেক গলাবাজি ক'রে বললে,—রাজার জন্য যুদ্ধ, দেশের জন্য !'

অমনি সবাই চেঁচিয়ে উত্তর দিলে,—'হ্যাঁ ঠিক ঠিক, রাজার জন্য, দেশের জন্য যুদ্ধ !'

শোভনা তখন বললে,—'আচ্ছা কচুরি-শিঙাড়া-নিমকি, তোমরা কি এই চপ-কাটলেটের দেশ জয় করতে চাও ?'

তারা চেঁচিয়ে বললে,—'না, আমরা চাই না।'

শোভনা আবার বললে,—'তবে চলো, আর মারামারি ক'রে লাভ নেই, নিজেদের দেশে চলো।'

দরবেশ দেখলে মুশকিল হ'লো। যদি যুদ্ধটা জিততুম, এতোক্ষণে কেকপুরীর সেই সুন্দরীকে বিয়ে ক'রে ফেলতুম। সে চারিদিকে জিলিপির খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু রণক্ষেত্রে জিলিপি মন্ত্রীকে পাবে কোথায়! সেখানে তার টিকিও দেখা যায় না। ও-সব মারামারির মধ্যে যেখানে প্রাণ হারাবার ভয় আছে, এমন জায়গায় সে ভুলেও পা দেয় না। সে যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে থেকে পরামর্শ দিতে, দেশে-দেশে রাজায়-রাজায় অকারণে যুদ্ধ বাধিয়ে মজা দেখতে ওস্তাদ।

যুদ্ধটা বেশ জমছিল, হঠাৎ এমন থেমে গেল দেখে রসগোল্লা-সেনাপতিরও ভারি খারাপ লাগছিল। সে আপন মনে সৈন্য-চালনা ক'রে শত্রু-খাবার মেরে ভারি আনন্দ পাচ্ছিল। সে সৈন্যদের ক্ষেপাতে চেষ্টা ক'রে বিফল হ'লো।

প্রভাত ও শোভনা সবাইকে বুঝিয়ে দিলে, বাস্তবিকই দুই পক্ষে যুদ্ধ করার কোনো সংগত কারণ নেই, তাদের কোনো শত্রুতা নেই; তারা তো সব খাবার-ভাই।

সবাই ব'লে উঠলো,—'ঠিক, ঠিক !'

প্রভাত ও শোভনা দু-জনে হাসিমুখে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়ালো,

তাদের ঘিরে যত খাবার নাচতে গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কচুরি-শিঙাড়াদের সঙ্গে কেকের বিবিরা, নিমকি-গজার সঙ্গে চপ-কাটলেটের মেয়েরা, পান্তুয়াদের সঙ্গে সব মিস্ লজেনচুস হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

শোভনার যখন ঘুম ভাঙলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। অবাক হ'য়ে চোখ মেলে সে দেখলে, খোলা জানলার পাশে ময়রার দোকানের ছেলেটি একঠোঙা খাবার নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে তার দিকে চাইলো। এবার প্রভাত পালালো না, শুধু হাত বাড়িয়ে খাবারের ঠোঙা দিতে চেষ্টা করলে। তার হাসিভরা চোখদুটো যেন বলতে চাইলো—তোমার জন্যে এই সন্দেশ রসগোল্লা জিলিপি গজা সব এনেছি, তুমি আমাকে তোমার বিস্কুট কেক কিছু দাও। শোভনা তাকে আপন ঘরে ডেকে এনে কত নতুন নতুন মজার খাবার খাওয়ালে!

সেইদিন থেকে শোভনার সব অসুখ সেরে গেল। এতদিন ডাক্তার-বাবু এত ওষুধ দিয়ে যা সারাতে পারেননি, একদিন সন্দেশরাজার দেশ বেড়িয়ে এসে তা সেরে গেল।

রূপকথার কেলেঙ্কারি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপকথার রাজ্যে কেলেঙ্কারির একশেষ!

এমন কেলেঙ্কারি সেই গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা'র দিন থেকে আর কখনো হয়নি। চারিদিকে এই নিয়ে প্রথমে ফিশফাশ কানাঘুষো, তারপর টি-টি। রাজপুরীর দেওয়ালের গায়ে পর্যন্ত পোস্টার প'ড়ে গেল—'রূপকথার রাজ্যে দুর্নীতি—বজ্রকুমারের সকল কীর্তি ফাঁস।' পথে-ঘাটে হাজারে-হাজারে 'তেপান্তর' কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ বিক্রি হ'য়ে গেল!

ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখা গেল না, এত জানাজানি পর! বিশেষ ক'রে 'তেপান্তর' কাগজের গরম-গরম সম্পাদকীয়গুলোর ঠেলাতেই রূপকথার রাজ্যের রাজারাজড়া থেকে সমস্ত হোমরাচোমরা কর্তাদের উঠে বসতে হ'লো—একটা-কিছু না করলেই আর নয়।

কিন্তু, কী করা যায়? রাজা থেকে পাত্র মিত্র মন্ত্রী কোটাল কারো কোনো ধারণাই নেই এ-বিষয়ে। এমন ব্যাপার তো কস্মিন কালে ঘটেনি! তার মীমাংসার কোনো নজিরও কোথাও নেই।

রাজসভার সবাই শুকনো মুখে সেই কথাই ভাবেন। কোথা থেকে এমন ফ্যাসাদ যে এলো! বেশ চ'লে যাচ্ছিল রূপকথার রাজ্য। বিপদ-আপদ গণ্ডগোল ছিল না এমন নয়, রাক্ষস খোক্কোস দৈত্য-দানো হানা দিত মাঝে-মাঝে! রাজপুত্তুরদের যেতে হ'তো সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির খোঁজে। ডাইনির মন্তরে রাজকন্যার সোনার রূপ পুড়ে খাক হ'তো। কিন্তু

তারপর আবার সব ঠিক হ'য়ে যেতে দেরি হ'তো না; কারণ সে-সব মুশকিলের আসান তাদের জানা। বরাবর একভাবেই তার কিনারা হ'য়ে আসছে।

কিন্তু এ-বিপদ যে একেবারে আলাদা।

ব্যাপারটা শুরুতে কিছুই বোঝা যায়নি। রূপকথার রাজ্যে যেমন দস্তুর, সেইমতো আজ এ-রাজ্যে কাল সে-রাজ্যে ভয়ঙ্কর রাক্ষস এসে হানা দিয়েছে। রোজ একটা ক'রে মোটা মোটা নধর মানুষের বরাদ্দ তার চাই। নইলে সমস্ত রাজ্য সে দেবে পেটে পুরে।

রাজারাজড়ারা নিরুপায় হয়ে সায় দিয়েছেন আর সেইসঙ্গে ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন—এ-রাক্ষস যে মারতে পারবে, তার কপালে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা, না-পারলে রাক্ষসের একবেলার জলপান।

দেশবিদেশের রাজকুমারেরা এসে হার মানবার পর কোথা থেকে উদয় হয়েছেন রাজপুত্র বজ্রকুমার।

নিশুতি রাতে খাঁড়া হাতে বজ্রকুমার একা গেছেন রাক্ষসের গুহায় লড়তে। রাজ্যের লোক ঘরে খিল দিয়ে সারা রাত জেগে ভয়ে কেঁপেছে। অন্ধকারে আকাশ-ফাটানো সে কী যুদ্ধের হুঙ্কার! পৃথিবী-ফাটানো সে কী দাপাদাপি!

পরের দিন ভয়ে-ভয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়েছে, যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো সংশয় নেই। অমন অনেক রাজকুমারকে তারা লড়তে যেতে দেখেছে।

কিন্তু এ কী তাজ্জব ব্যাপার! পাহাড়ের পথে বজ্রকুমারই একা নেমে আসছেন। খাঁড়া তাঁর তাজা রক্তে লাল।

তারপর বজ্রকুমারের জয়-জয়কার! রাজ্যময় উৎসব পড়ে গেছে! রাক্ষসের লাশটা পেলে উৎসবটা বুঝি একটু ভালো ক'রে জমতো! কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে! শোনা যায় বজ্রকুমার তাকে চারটুকরো করে পৃথিবীর চার কোণে ফেলে দিয়েছেন।

রাক্ষস মেরে বজ্রকুমার কিন্তু ভারি অদ্ভুত বায়না ধরেছেন। অর্ধেক রাজত্ব তাঁর চাই, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করতে তিনি নারাজ। রাজকন্যার বদলে তাঁকে বেশ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ধ'রে দিতে হবে।

এমন উদ্ভুটে কথা কেউ কখনো শুনেছে! রাজ্যসুদ্ধ সবাই তো হতভম্ব! এটা অপমান ভেবে রেগে উঠবেন, না ঠাট্টা ভেবে হেসে উড়িয়ে দেবেন, রাজা তো ভেবেই পান না প্রথমত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাজকুমারের কথামতোই রফা করতে হয়। অর্ধেক রাজত্বের ভাগ, আর রাজকন্যার বদলে কাঞ্চনমূল্য নিয়ে বজ্রকুমার রওনা হ'য়ে পড়েন পাশের রাজ্যের পানে।

পাশের রাজ্যে রওনা হওয়ার কারণ আছে। সেখানেও কিছুদিন থেকে শুরু হয়েছে এক রাক্ষসের উৎপাত।

পাশের রাজ্যে রাক্ষসের উপদ্রব বন্ধ ক'রেও বজ্রকুমার দু-দণ্ড হাঁফ ছেড়ে জিরিয়ে নেবার অবসর পান না। খাঁড়া হাতে তাঁকে ছুটতে হয়েছে তার পাশের রাজ্যে।

এমনি পর-পর—রাক্ষসের উৎপাতও শেষ হয় না, বজ্রকুমারের ছোটাছুটির-ও কামাই নেই!

সব রাজ্যে বজ্রকুমারের সেই এক দর,—অর্ধেক রাজত্ব, আর রাজকন্যার বদলে কাঞ্চনমূল্য। দেখতে-দেখতে বজ্রকুমারের ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তির আর সীমা থাকে না। রূপকথার রাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব তাঁরই দখলে। সোনাদানাও যা-কিছু সব তাঁর ভাঁড়ারে।

এমনি ক'রে গোটা রূপকথার রাজ্যই হয়ত বজ্রকুমারের হাতের মুঠোয় এসে পড়তো, কিন্তু গোল বাধলো লৌহগড়ের রাক্ষস মারতে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যা পুষ্পবতীকে দেখে।

বজ্রকুমার যথারীতি রাক্ষস মেরে নগরে ফিরছেন, মাঝপথে রাজ্যের লোক এগিয়ে এসেছে তাঁকে অভিনন্দন দিতে, সেইসঙ্গে এসেছেন রাজকন্যা পুষ্পবতী—সোনার সাজ, রুপোর ঝালর দিয়ে সাজানো রথে।

চারচক্ষের মিলন হ'লো। বজ্রকুমারের বজ্রের মতো কঠিন প্রতিজ্ঞা

গেল আলগা হ'য়ে। অর্ধেক রাজত্ব চাইলেন, কিন্তু রাজকন্যার বদলে কাঞ্চন-মূল্য আর চাওয়া হ'লো না।

দেশময় আনন্দ-উৎসব প'ড়ে গেলো। এতদিনে বজ্রকুমারের মন ফিরেছে—পুষ্পবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে।

ধুমধাম ক'রে বিয়ের আয়োজন চলছে, এমন সময় শুরু হ'লো ফিশফাশ কানাঘুষো।

রূপকথার রাজ্যে কিছুদিন থেকে বেরিয়েছে নতুন কাগজ 'তেপান্তর'।

রাক্ষস মারার অভিযান শুরু হওয়া থেকে 'তেপান্তর'ই সবচেয়ে জোরে বজ্রকুমারের ঢাক পিটে আসছে। সেই তেপান্তর'ই হঠাৎ একটু উল্টো সুর ধরলে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বার হ'লো : বজ্রকুমার বিয়ে করছেন, সুখের কথা। কিন্তু দেশের কল্যাণ যাঁর ব্রত, তাঁর আদর্শ আরও কঠোর হওয়া উচিত নয় কি? বজ্রকুমারের মতো রূপকথার রাজ্যের এমন অসাধারণ বীর যদি আর পাঁচজনের মতো নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই বড়ো ক'রে দেখেন, তাহ'লে তাঁর কাছে দেশ আর কী আশা করতে পারে? ইত্যাদি।

বিয়ের দিন কিন্তু তা সত্ত্বেও এগিয়ে আসতে লাগলো। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প'ড়ে বজ্রকুমারের মত বদলাবার কোনো আভাস দেখা গেল না।

বিয়ের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। এমন সময় 'তেপান্তর' তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলে। 'তেপান্তরে'র সম্পাদকীয় কলমে বোমার মতো এক শিরোনামা ফেটে বেরোলো—'বজ্রকুমারের বুজরুকি!'

'তেপান্তর' আগুনের মতো গনগনে ভাষায় বজ্রকুমারকে আক্রমণ ক'রে লিখেছে—'হয়-রাজ্য থেকে নয়-রাজ্য পর্যন্ত রূপকথার দেশের অনেক রাজ্যেই তো বজ্রকুমার রাক্ষস মেরেছেন ব'লে শোনা যায়। কিন্তু একটি রাক্ষসের লাশ এ-পর্যন্ত কেউ দেখছে কি! এতগুলো

রাক্ষসের লাশ একত্র করলে তো দশটা পাহাড় হ'য়ে যেত। সে লাশ গেল কোথায়? আর সে লাশ যখন পাওয়া যায় না, তখন বজ্রকুমারের কীর্তি বিশ্বাস করা যায় কী ক'রে? এর ভেতর কোথাও একটি কারসাজি আছে ব'লেই সন্দেহ হয়।

একদিন গেল, দু দিন গেল, 'তেপান্তরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ গরম থেকে আরো-গরম হ'য়ে উঠলো। রূপকথার রাজ্য আর ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকতে পারে! তিনদিনের দিন লৌহগড়ের রাজপুরীর দেউড়ির বাইরে দেখা গেল রাজ্যের লোক ক্ষেপে উঠে জড়ো হয়েছে আর চিৎকার করছে—'ডাকো বজ্রকুমারকে,—দেখাও রাক্ষসের লাশ!'

বিয়ের উৎসবের আর মাত্র দু'দিন বাকি,—এমন সময় এই ফ্যাসাদ।

রাজা তাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, সেই সঙ্গে পাত্র-মিত্র কোটাল-মন্ত্রী সবাই। রাজসভায় সবাই কাঠের পুতুলের মতো নিস্তব্ধ। কারুর মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলে না, কেউ একটা উপায় বাতলাতে পারে না।

উপায় বার করা তো সোজা নয়—এ-যে এগোলেও নির্বংশ পেছোলেও নির্বংশ। গুজব যা রটেছে, তার একটা মীমাংসা না-হ'লে লাঠালাঠি বেধে যায়, আবার বজ্রকুমারের মতো বীরকে কৈফিয়ৎ চেয়ে ঘাঁটাতেও সাহসে কুলোয় না।

রাজামশাই ভয়ে ভাবনায় ঘেমে উঠেছেন, মন্ত্রীমশাই ঘন-ঘন নস্যি নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার ক'রে ফেলেছেন উপায় বার করতে, কোটালমশাই চোখ বুজে ভাববার ভান ক'রে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় দ্বারী হেঁকে জানালে—বজ্রকুমার আসছেন রাজসভায়।

এমন সময় রাজসভায় বজ্রকুমার। রাজসভার সবাই শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। যা জোয়ান গোঁয়ার,—সব দেখে-শুনে রেগে গিয়ে একটা কাণ্ড না ক'রে বসে।

কিন্তু বজ্রকুমার কোনো কাণ্ড করলেন না। রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নেহাৎ শান্তভাবে বললেন, 'মহারাজ, আমি বিচার চাই।'

বিচার ?

মহারাজ সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের বিচার ?'

'আজ্ঞে আমার নিজের বিচার। শুনছি আমার রাক্ষস মারা ব্যাপারটা বুজরুকি ব'লে কথা উঠেছে। তারই বিচার আমি চাই।'

মন্ত্রীমশাই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্যে বললেন, 'আরে রামঃ, ও-সব কথা আবার ধর্তব্য! আপনি রাক্ষস মারেন নি তো মারলে কে ? তবে কিনা...'

'সেই "তবে কিনা"র জন্যেই আমার বিচার চাই,—সকলের মাঝে খোলা সভায় কাল আমার বিচারের ব্যবস্থা করুন।'—গম্ভীরভাবে ব'লে বজ্রকুমার চ'লে গেলেন।

মস্ত বড়ো বিচারসভা বসেছে। সকাল থেকে সেখানে লোকে লোকারণ্য। বজ্রকুমার এসে পৌঁছতেই একদল অভ্যাসমতো 'জয় বজ্রকুমারের জয়' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আরেকদলের 'ধিক—ধিক' চিৎকারে সে জয়ধ্বনি চাপা প'ড়ে গেল।

বজ্রকুমার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বিচার শুরু হ'লো।

মন্ত্রীমশাইএর ওপরেই বিচারের ভার। নানান মিষ্টি কথায় মোলায়েম ক'রে তিনি কোনোমতে ভয়ে-ভয়ে বজ্রকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগটা জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'রাজ্যে একটা গুজব উঠেছে, বজ্রকুমার নাকি রাক্ষস মারেন নি, ফাঁকি দিয়ে রাজত্ব আদায় করছেন। অবশ্য সবাইকার মত এরকম নয়। তবু, রাক্ষসগুলোর লাশ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বজ্রকুমারের কাছ থেকে একটা কিছু শুনতে পেলে ভালো হয়।...'

মন্ত্রীমশাইএর কথার ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেলো, বজ্রকুমার

একবার অভিযোগ অস্বীকার করলেই তিনি মামলা ডিসমিস ক'রে দেন।

মন্ত্রীমশাইএর বক্তৃতা শেষ হবার পর বজ্রকুমার গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। সমস্ত সভায় টুঁ শব্দটি নেই। সবাই নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আছে—বজ্রকুমার কী বলেন শোনার আগ্রহে।

বজ্রকুমার সবাইকে একেবারে থ ক'রে দিয়ে বললেন, 'মন্ত্রীমশাই, গুজব যা রটেছে তা মিথ্যা নয়।'

সভায় একটা গুনগুন শব্দ আরম্ভ হ'তেই ইঙ্গিতে তা থামিয়ে বজ্রকুমার আবার বললেন, 'কিন্তু আমার অপরাধের শাস্তি নেবার আগে দু-জন সাক্ষী আমি ডাকতে চাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করবার জন্যে। আমার প্রথম সাক্ষী ...' ব'লে ইশারা করতেই বিচারসভায় যে ঢুকলো তাকে দেখে সভাসুদ্ধ লোকের চক্ষুস্থির। অর্ধেক লোক তো সেইখানেই তৎক্ষণাৎ ভিরমি গেল ভয়ে।

সাক্ষী আর কেউ নয়, স্বয়ং রাক্ষস। তবু তাকে দেখে অতটা ভয় না-পেলেও বোধহয় চলতো। রাক্ষস হ'লে কী হয়, বিচারসভায় সে বেশ ভদ্রভাবেই ভব্যিযুক্ত হ'য়ে এসেছে দেখা গেলো। নখ-চুল ছাঁটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো,—গায়ে দস্তুরমতো দামি জামা-কাপড়। আর তেমন জোয়ান রাক্ষসও সে নয়। চুলে তার টাকও পড়েছে পাকও ধরেছে, দাঁতও পড়েছে অনেকগুলো। কুঁজো হ'য়ে ছাড়া চলতে পারে না।

তাছাড়া রাক্ষস যে অমন হাবাগোবা ভালোমানুষ হয়, চোখে না-দেখলে কে বিশ্বাস করতো? কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে মন্ত্রীমশাইকে নমস্কার ক'রে সে হাউ-মাউ-খাঁউ ক'রে কেঁদে ফেলে বললে, 'ধর্মাবতার, আমি নেহাৎ মুখ্খু শাদাশিদে রাক্ষস; রাক্ষসকুলের সাবেকি সনদের জোরে পুরুষানুক্রমে রূপকথার রাজ্যে একটু-আধটু উপদ্রব ক'রে আসছি। দুষ্ট লোকের কুপরামর্শ শুনে আজ আমার এই দুর্দশা। আমার কসুর মাপ করুন ধর্মাবতার।'

মন্ত্রীমশাই এবং সভাসুদ্ধ লোক তখন প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেছেন। মন্ত্রীমশাই সাহস ক'রে বেশ-একটু কড়া গলায় ধমক দিলেন, 'থামাও তোমার কান্না। কাঁদতে লজ্জা করে না? বুড়োধাড়ি হ'য়ে মরবার বয়স হ'লো যে।'

রাক্ষস চাদরে চোখ মুছে বললে, 'আজ্ঞে, সেই দুঃখেই তো কাঁদি। রাক্ষসকুলে আমার মতো হতভাগা কেউ নেই। কোথায় বয়সকালে বাপ-পিতাম'র নাম রেখে রাজপুত্রের খাঁড়ায় মারা যাবো, না, লোকের কুমতলব শুনে লোভে প'ড়ে বুড়ো হওয়ার জ্বালা ভোগ করছি। কেন যে আমার দুর্মতি হয়েছিল...'

মন্ত্রীমশাইয়ের ভয় ইতিমধ্যে একেবারে ঘুচে গেছে রাক্ষসের ভাব-গতিক দেখে। এবার নির্ভয়েই ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'আ মোলো যা, তবু কাঁদে। আরে কে তোমায় কী কুমতলব দিলে শুনি?'

রাক্ষস ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললে, 'তার নাম জানিনা হুজুর, তবে গন্ধটা চিনি। সে গন্ধটা যেন এখানেও পাচ্ছি।'

রাক্ষস বেশ-একটু চঞ্চল হ'য়ে চারিদিকে নাক ঘুরিয়ে হঠাৎ একদিকে আঙুল তুলতেই দেখা গেল, বিচারসভা থেকে 'তেপান্তর'-এর সম্পাদক ও মালিক হন্তদন্ত হ'য়ে স'রে পড়ছেন। কিন্তু স'রে পড়বেন কোথায়? বজ্রকুমার একলাফে গিয়ে তাঁকে ধ'রে ফেলে বললেন, 'এই আমার দু-নম্বর সাক্ষী, মন্ত্রীমশাই।'

ধরা প'ড়ে 'তেপান্তর'এর মালিকের চেহারা তখন বদলে গেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর সে কী তেজ! প্রথমেই তিনি শাসিয়ে দিলেন, তাঁকে এভাবে মিছিমিছি নাকাল করার ফল তিনি বুঝিয়ে দেবেন। 'তেপান্তর'এ এমন লেখা লিখবেন......

মন্ত্রীমশাই বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তেপান্তর'এর সব লেখা কি আপনি লেখেন?'

'হামি লিখবো কেন!' মালিক চ'টে উঠলেন রীতিমতো—'হামি কি কেরানি আছি! হামি খালি মতলব দিয়ে লিখিয়ে লিই।'

'বেশ, বেশ! আপনার নাম?'

'আইজ্যাক কুবেররাম ফাটকাবাজ।'

'কুবেররাম! এ তো রূপকথার নাম নয়? রূপকথার দেশে কেমন ক'রে এলেন?'

কুবেররাম আরো গরম হ'য়ে উঠলেন, 'কেন, রূপকথায় কি আমাদের মানা আছে? হামি লোক আজকাল ফিলিম বনাই, কোতো পৌরাণিক সামাজিক গল্‌পো পটপট কাটিয়ে বদল কোরে দিই, রূপকথায় কেন আসবো না?'

'কিন্তু কুমতলব দিয়ে এ-রাজ্যের ধারা বিগড়ে দেবার অধিকার তো আপনার নেই!'

'কুমতলব!' রাগের চোটে কুবেররামের আর মুখের বাঁধ রইলো না—'এখন তো কুমতলব বলবেই। কোথায় থাকতো এতদিন ঐ হাবা রাক্ষস! কোন রাজপুত্রের খাঁড়ার ঘায়ে কবে কাবার হ'য়ে যেত! এমন সাজগোজ ক'রে সভায় আসতে হ'তো না। আর রাজপুত্র বজ্রকুমার! তারই বা কী দশা হ'তো! একটা রাক্ষস মেরে একরত্তি রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়েই খুশি থাকতে হ'তো চিরদিন। এই যে এতো বড়ো জমিদারি, ঐশ্বর্য, এসব কার দৌলতে? রাক্ষসের সঙ্গে লুকিয়ে রফা ক'রে দেশ-বিদেশে তাকে মেরে বেড়াবার ভান করার মতলব সে দিয়েছিল ব'লেই না। তার বদলে কুবেররাম নিজে কী নিয়েছে? মাত্র ছ-আনা বখরা। শুধু নিজের আহাম্মুকিতেই না বজ্রকুমার এমন লাভের ব্যবসা নষ্ট ক'রে দিল। আজ বিয়ের নামে এমন ক্ষেপে না-উঠলে কুবেররামকেও 'তেপান্তর'এ উল্টো গাইতে হয় না, এ মোকদ্দমাও ওঠে না!'

কুবেররামের আস্ফালন শেষ হ'লো। খানিকক্ষণ সমস্ত সভায় আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। রূপকথার রাজ্যে এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। কা ভাববে তাই তারা তখন ঠিক ক'রে উঠতে পারছে না।

মন্ত্রীমশাই পর্যন্ত গোড়ায় বুঝি একটু হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলেন,

কিন্তু খানিক বাদেই মন স্থির ক'রে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কুবেররাম, আপনার ব্যবসা-বুদ্ধির আমরা তারিফ করি। আপনি শূন্যকে সোনা করতে পারেন। কিন্তু এ-রাজ্য এখনো আপনার কদর বোঝবার উপযুক্ত হয় নি। আপনাকে নির্বাসন দণ্ডই নিতে হবে।'

কুবেররাম মুখ চুন ক'রে বললেন, 'তোবে হামার ছ-আনা বখরার দাম দিয়ে দিন। হামি ফের ফাটকা বাজার চোলে যাই।'

শীতের শেষ হইয়া আসিয়াছে। সামনেই বসন্তকাল। এখনো অবশ্য বসন্ত ভালভাবে দেখা দেয় নাই, কেবল 'দি হেভেনওয়ার্ড' পত্রিকা খবর দিয়াছেন, সুদূর কলিকাতার কোন্ অঞ্চলে নাকি দু-চারটি কেস দেখা গেছে। তাও আবার আসল বসন্ত বা স্মল পক্স নয়, জল-বসন্ত। ঠিক ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন আসিবে তখনই শুরু হইবে আসল বসন্তের কাল।

শকুনি মামী নিজে দাঁড়াইয়া দাসী-চাকরানীদের দিয়া শাল-দোশালা প্রভৃতি গরম কাপড়গুলি গুছাইতেছিলেন। শীত চলিয়া গেছে, তাই এগুলিকে ধোয়াইবার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইতে হইবে। আমেরিকার ফোর্ড সাহেবের মতো নিতান্ত গরিব যারা তারাই কেবল এখন নিজেদের দেশে কাপড়-চোপড় ধোয়ায়; বড়লোকেরা ময়লা কাপড়ের বোচকা ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেয়।

শকুনি মামা-মামী বলিতে যেন শ্মশান-ভাগাড়ের গৃধিনী-পাখির বন্ধুদের ঠাওরাইও না—দুর্যোধনের মামা শকুনি, গান্ধার দেশে তাঁর বাড়ি।

হ্যাঁ, যা বলিতেছিলাম। শকুনি মামী দাসীদের দিয়া কাপড় গুছাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁর কানে গেল, নিচে ভোজপুরী দরওয়ানটা 'টেলিগেরাফ টেলিগেরাফ' বলিতেছে। টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া মামী তাড়াতাড়ি সেদিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেখিলেন শকুনি মামা নিজেই সেখানা হাতে নিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। উৎসুকভাবে মামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগা, কার টেলিগ্রাম গা ওখানা?'

'দুর্যোধন ভাগ্নের। ভারি জরুরি তার। আজই হস্তিনাপুর মেলে রওনা হ'য়ে পড়তে লিখছে।'

মামী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'তাই তো, কোনো বিপদ-আপদ না ঘ'টে থাকলে বাঁচি!'

শকুনি মামা তাঁর শশার মতো ছুঁচালো মুখখানাকে আরও ছুঁচালো করিয়া বলিলেন, 'তা মনে হয় না, দুর্যোধন ছোকরার সাহস আছে, হঠাৎ ঘাবড়ায় না। আমার বোধ হয়, গত বচ্ছর দাবা খেলতে গিয়ে ওরা যে ক্যাপাব্লাঙ্কার কাছে হেরে এসেছে, এবার পাশা কম্পিটিশনে সে-অপমানটার শোধ তুলতে চায়। বাবাজীর তাই আমার কথা মনে পড়েছে।'

যথাসময়ে হস্তিনাপুর স্টেশনে শকুনি মামা গাড়ি হইতে নামিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া নিতে দুর্যোধন নিজে আসিতে পারেন নাই, ছোট ভাই বিকর্ণকে পাঠাইয়াছেন। গেটে টিকিট দেখাইয়া বিকর্ণ ও শকুনি মামা বাহিরে আসিলেন। শকুনি ভাবিয়াছিলেন দুর্যোধন মানী লোক, মামার মান রাখিতে নিশ্চয়ই সোনার হাওদা-ওয়ালা জাঁকালো চেহারার একটা হাতি-টাতি পাঠাইবেন। তা নয় তো, মোটর। ছ্যাঃ, ও তো ফোর্ড সাহেবও চড়ে।

কিন্তু মামা থাকিতেন দিবারাত্র পাশার আড্ডায় পড়িয়া। কেন যে দুর্যোধন হাতি না পাঠাইয়া মোটর পাঠাইয়াছেন, সে-খবর তিনি কী রাখিবেন? হস্তিনাপুরের রাজা এখন যুধিষ্ঠির; তিনি ধর্মরাজ, কাজেই তাঁর রাজত্বে অধর্ম হওয়ার জো-টি নাই—মিথ্যার কোনই প্রশ্রয় নাই। গদিতে বসিয়াই তিনি যখন দেখিলেন শহরের রাস্তায় রাস্তায় বড়োলোকদের হাতি ঘুরিয়া বেড়ায়, অমনি তিনি শহরময় ঢোল পিটাইয়া দিলেন—আজ হইতে শহরের নূতন নাম করা হইল হস্তি-হীনপুর। শহরে হস্তী থাকিবে অথচ নাম হইবে হস্তি-নাপুর? এ যে মিথ্যা কথার চূড়ান্ত!

কিন্তু নানা দিক হইতে ঘোর প্রতিবাদ আসিতে লাগিল। ডাক্তার উকিলেরা বলিলেন, তাঁরা সম্বৎসরের চিঠির কাগজ, ভিজিটিং কার্ড প্রভৃতি ছাপাইয়া ফেলিয়াছেন। শহরের নূতন নাম হইলেই এ-সমস্ত ফেলিয়া দিতে হইবে যে! দোকানদাররা জানাইল, তাদের সাইন-বোর্ডগুলির পুরানো নাম মুছিয়া নূতন নাম লিখাইতে যে ফের খরচের দরকার, গরিব লোকদের এই লোকসান করানোই কি ধর্মরাজের ধর্মবিচার হইল ? রেলওয়ে, পোস্ট-আপিশও আপত্তি করিল—এ বছর বড়ই টাকার টানাটানি। নূতন সীলমোহর করা, নূতন টিকিট ছাপানো —ওসব পোশাইবে না। কেবলমাত্র ছাপাখানার মালিক আর আর্টিস্টরা এ-প্রস্তাবে ভারি খুশি হইলেন। তাঁরা ঠিক করিলেন, একটা যুধিষ্ঠির-জয়ন্তী করিবেন।

যুধিষ্ঠির মহা ভাবনায় পড়িলেন! কী ভাবে সকলের লোকশান বাঁচাইয়া সত্যের মর্যাদা রাখা চলে। পঞ্চপাণ্ডব মিলিয়া অনেক শলা-পরামর্শ করিলেন। শেষটা ভীম বুক ঠুকিয়া বলিলেন, 'কুছ্ পরোয়া নেই দাদা, বহাল রাখো তুমি হাস্তি-নাপুর নামই। আমি দেবো কাল সব হাতিগুলোর ল্যাজ টেনে শহরের বাইরে ফেলে। তবে তো আর আপত্তির কারণ থাকবে না!'

কথাটা সকলেরই ভালো লাগিল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কিন্তু হাতির মালিকদের তো দাম ধ'রে দিতে হবে! সহদেব, তুমি যাও, দুনিয়ার বড়ো-বড়ো খবরের কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দাও যে, যদি কেউ হাতি কিনতে চায় তো শস্তা দরে দেওয়া যাবে।'

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—সব মহাদেশের কাগজেই তখন বিজ্ঞাপন ছাপা হইল। ফলে দালালের দল রাজবাড়িতে আনাগোনা করিতে লাগিল এবং তাদের সঙ্গে দর-কষাকষিতে সহদেবের রোজ এত সময় কাটিতে লাগিল যে পঞ্চপাণ্ডবের একত্রে খাইতে বসিতে প্রত্যহ বেলা বাজিতে লাগিল আড়াইটা। ভাগ্যিস দ্রৌপদীর চার্জে খাবার জিনিশ কখনও কম পড়ে না—এক কণা শাকেও তো একবার তিনি দুর্যোধনের

হাজার-হাজার লোককে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন—নতুবা সে-সময় ভীমের যেরূপ ক্ষুধা পাইত তাহাতে রাজবাড়ির আর কারো বরাতে কিছু জুটিত কি না ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

হাতি কিনিতে সবচাইতে সুবিধার দর দিয়াছিল লঙ্কাপুরের হোটেলওয়ালারা। সেখানকার তরুণ রাক্ষসদের মধ্যে হাতির চপ খাওয়া নাকি আজকাল মস্ত একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই রেস্টুরেণ্টওয়ালারা কোনো দাম দিতেই পিছপা নয়। যুধিষ্ঠিরকে সে-কথা জানাইতেই কিন্তু তিনি একেবারে কানে আঙুল দিলেন—কী, ধর্মরাজ্যে নিরর্থক প্রাণীহত্যা! যাও সহদেব, বল গে আমি হাতি বেচবো না। ওদের আমি নৈমিষারণ্যে ছেড়ে দেবো।'

নকুল ছিলেন সে-অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার—যাকে বলো তোমরা ভেটিরিনারি সার্জন। তিনি বলিলেন, 'দাঁড়াও বড়দা, ওদের বরং আমি একটা মস্ত উপকার ক'রে দিচ্ছি। আজকাল চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে, প্রাণীদের শরীরের এক-এক জায়গায় অপারেশন ক'রে তাদের চেহারা একেবারে বদলে দেওয়া যায়। বুড়োমানুষদের ছেলেমানুষ করা, ছেলেমানুষদের বুড়ো করা—তো হরদমই চলছে।' এই বলিয়া তিনি ছুরি হাতে হস্তিনাপুরের প্রত্যেক হাতির গলার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে এক-একটা অপারেশন করিয়া দিলেন, অমনি, কী আশ্চর্য—হাতিগুলি সব মানুষ হইয়া গেল। কেবল তাদের পেটটি কমিল না। সেই পেটমোটা লোকগুলি তারপর পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আজ পর্যন্ত সকলে তাদের দেখিলেই বলে—'বাবাগো, লোকটা হাতি!' এইভাবে হস্তিনাপুরের সমস্ত হাতি লোপ পাইল, যুধিষ্ঠিরও মিথ্যার হাত এড়াইলেন।

শকুনি মামা বিকর্ণের সহিত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখেন, দুর্যোধন সোফার উপর আচ্ছন্ন হইয়া আছেন আর গান্ধারী তাঁর মাথায় ওডিকোলন দিয়া এবং কর্ণ পাশের চেয়ারে বসিয়া অর্জুনের নিন্দা করিয়া তাঁকে চাঙা করিতেছেন। মামাকে দেখিয়াই দুর্যোধন সোফার

উপর সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, 'মামা, তুমি এসেছো? আঃ, বাঁচালে! এবার শিগগির একটা উপায় বাৎলে দাও মামা, নইলে আমি তো মারা যাই!'

শকুনি মামা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, 'কেন বাবা, কী হয়েছে তোমার?'

দুর্যোধন একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'রাত্তির দিন দরজা এঁটে পাশা খেলবে মামা, দুনিয়ার খবর আর রাখবে কখন? যুধিষ্ঠিরদা যে এদিকে ভুঁইস্যুয় যজ্ঞের মৎলব এঁটেছেন সে খবর রাখো কি? একবার যদি এ যজ্ঞে তিনি আহুতি দিতে পারেন তবে আমি গেছি। হস্তিনাপুরের আশেপাশের সব লোক তবে তাঁকেই একমাত্র ভুঁইয়ের মালিক অর্থাৎ রাজা বলে মেনে নেবে। এমনকি আমার প্রজারাও। থাকবো তখন আমরা ওঁর গোমস্তা হয়ে। বিদুর কাকা কুপরামর্শ দিয়ে দিয়ে ওঁদের মাথা বিগড়ে দিয়েছেন—যজ্ঞ আরম্ভ হ'লো ব'লে। সারাদিন তারই আয়োজন চলছে। ওঁদের আর ভাবনা কী বলো? মস্ত শ্বশুর আছেন দ্রুপদ রাজা, তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন,—'লাগাও যজ্ঞ, চালাও এলাহি ব্যাপার, বামুন ভোজ। আমি আছি পাঞ্চাল দেশের রাজা; গত পান আর চাল লাগে দেবো, ভাবনা কী? বাংলাদেশের মছলিখোর বামুনেরা মাছের বন্দোবস্ত না থাকলে আসবে না জানিয়েছে। এখানেও ভারি সুবিধে। অর্জুনের বেয়াই, উত্তরার বাপ বিরাট রাজা গোটা মৎস্য দেশটারই মালিক, মাছ সাপ্লাইয়ের ভার তিনি নিয়েছেন; যুধিষ্ঠিরদা বলেছেন মরা মাছ হ'লেও তাঁর আপত্তি নেই। আর কুন্তীখুড়ী যদি এর ভেতর সময় ক'রে একবার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারেন, তবে তো পোয়া বারো। খোদ রাজা ভোজের মেয়ে তিনি, একেবারে পাকা ভোজের ব্যবস্থা ক'রে আসবেন।'

শকুনি মামা বলিলেন, 'তা বাবা, তুমিও কেন লাগাও না এক ভুঁইস্যুয় যজ্ঞ। বামুন খাওয়ানোর জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবে-খন। আমাদের গান্ধার দেশের পাহাড়ে এক নতুন রকমের সাপ দেখা দিয়েছে,

ইয়া মোটা মোটা, তার গা-ভরা চর্বি। আমি বরং সেই চর্বি খানিক পাঠিয়ে দেবো, ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে খরচা বারো আনা ক'মে যাবে। আর আমার বাড়িতে কতগুলি ভোজপুরী দারোয়ান রেখেছি, তুমি তাদের উল্টোভাবে, অর্থাৎ মাথা নিচু আর পা উঁচু ক'রে টাঙিয়ে রেখো। ভোজপুরী ওল্টালেই পুরী ভোজ পাওয়া যাবে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, এটা তোমাদের শত হ'লেও মেড়োর দেশ। খোট্টাগুলোকে পুরী দিয়ে ভোজ খাওয়ালে তারা যতোটা খুশি হবে, আর কিছুতে ততোটা হবে না।'

কর্ণ বলিলেন, 'পাল্টে যজ্ঞ করবার কথা আমাদেরও মনে এসেছিল মামা, কিন্তু সে আর এখন হয় না, ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। এখন পরামর্শ দিন কী ক'রে ওদের যজ্ঞ পণ্ড ক'রে দেওয়া যায়—সেইজন্যই আপনাকে আমরা তার করেছি।'

শকুনি আসিতে গান্ধারী চায়ের বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। মামা একটিপ জোর নস্যি নিয়া ভাবিতে বসিলেন। একটু বাদেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'ডাকো দেখি একবার দুঃশাসনকে! নেই সে এখানে? বারণাবতের লোকগুলো দুষ্ট হয়েছে, তাই তাদের শাসন করতে গেছে? তবে কে আছে এখানে তোমার ভাইয়েদের মধ্যে?'

দুর্যোধন জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে আপাতত তো এক বিকর্ণকে দেখছি।'

'ও ছোঁড়া বড় জ্যাঠা, যখন-তখন লম্বা-চওড়া ধর্মের বচন ঝাড়ে! তা যাক, ওকে দিয়েই চ'লে যাবে-খন কাজ।' বলিয়া শকুনি মামা তখন চুপিচুপি দুর্যোধন এবং কর্ণের নিকট তাঁর মৎলবখানা ব্যাখ্যা করিলেন। মামার বুদ্ধি দেখিয়া তাঁরা তখন তাঁর পায়ের ধুলা মাথায় নিলেন।

দুর্যোধন সেই রাত্রেই বিকর্ণকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন,

'ত্যাখ্‌ বিকর্ণ, তুই অনেক দিন হ'তেই একটা মোটর বাইকের বায়না ধরেছিস। তোকে দিই একটা মোটর বাইক কিনে, যদি তুই একটা কাজ করিস।'

বিকর্ণ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কী কাজ দাদা ?'

—'বলছি, অত চ্যাঁচাস নে। তোকে দিনকতক মামাবাড়ি গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। অবশ্যি রাতের বেলা বাড়ির ভেতরে বার হতে পারবি, কিন্তু দিনের বেলা ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে। কেন, কী জন্য—অতশত প্রশ্ন ক'রতে পাবিনে। এ-সব শর্ত মেনে চলতে রাজি থাকিস তো বোঝ্‌, মোটর বাইক কিনে দিই। দু'দিন বাদে শকুনি মামার সঙ্গে রাতারাতি বস্তাবন্দী করে তোকে গান্ধারে পাঠাবো। তা যতোদিন না পাঠাচ্ছি ততোদিন তুই আমার ঐ মাটির নিচেকার গুপ্ত ঘর 'পাতাল-কুঠি'তে বন্ধ থাকবি—ভালো রকম অক্সিজেনের বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, হাঁফ ধরবে না। আর তুই যখন যা খেতে চাইবি তখনই তাই দেওয়া হবে : শুধু, এ-কথা কারো কাছে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পাবিনে। আমরা বাইরে রটাবো, তুই বিবাগী হয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস। কেমন, রাজি ?'

মোটর বাইকের লোভে পড়িয়া বিকর্ণ রাজি হইয়া গেল।

পরের দিনকার কথা। সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যুধিষ্ঠির ছাড়া অপর চারিজন পাণ্ডব বায়োস্কোপে গিয়াছেন 'অল্‌ কোয়ায়েট অন্‌ দি কুরুক্ষেত্রা ফ্রন্ট' ছবি দেখিতে। হঠাৎ ওবাড়ি হইতে দুর্যোধনের খানসামা রক্তমুখে আসিয়া খবর দিল, বুড়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘন-ঘন ফিট হইতেছে—কী যে হয় বলা যায় না। যুধিষ্ঠির অমনি দারুণ ব্যস্ত হইয়া দুর্যোধনের বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। গিয়া দেখেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দুই চোখে অবিরাম জলধারা বহিতেছে, তিনি আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন, আর মাথা কুটিতেছেন। যুধিষ্ঠির মহা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হয়েছে জ্যাঠামশায়, আপনি অমন করছেন কেন ?'

'আর কী হয়েছে! আমার সোনার ছেলে বিকর্ণ বিবাগী হ'য়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে! কঞ্জুষ দুর্যোধনটা মোটর বাইক দিলে না, বাছা কোথায় এখন কে জানে! উহুঃ হুঃ!' ধৃতরাষ্ট্র ফের হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের কানে কানে বলিলেন, 'কর্তা খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। দ্যাখো দাদা, তুমি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু করতে পারো। নইলে এ-বয়সে……'

যুধিষ্ঠিরের বড়ই কোমল প্রাণ, বলিলেন, 'জ্যাঠামশায়, আপনি সুস্থ হোন, খান-দান। আমি বলছি, বিকর্ণকে যে ক'রেই হোক দু'দিনের ভেতর এনে হাজির করবো।'

শকুনি মামা পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'আপনি এবার উঠে হাত-মুখ ধোন, জামাইবাবু; যুধিষ্ঠির যখন কথা দিয়েছে তখন তার নড়চড় হবে না। সবাই জানে, পৃথিবী রসাতলে গেলেও যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে মিথ্যে বার হবার জো নেই। কেমন যুধিষ্ঠির, বিকর্ণকে তুমি দু'দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে কথা দিচ্ছ তো?'

বড়ই বদ অভ্যাস যুধিষ্ঠিরের, ফস্‌-ফস্‌ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়; তা না পারি তো প্রতিজ্ঞা করলাম, হস্তিনাপুর ছেড়ে বনবাসী হবো।'

শকুনি, কর্ণ এবং দুর্যোধনের চোখে-চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র খাইতে বসিলেন।

যুধিষ্ঠির যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব বায়োস্কোপ হইতে বাড়ি ফিরিয়াছেন। তাঁদের সবাইকে ডাকিয়া তিনি সন্ধ্যার ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া অর্জুনের তো চক্ষুস্থির! 'অ্যাঁ, কী বলছ, একেবারে বনে যাবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছ? এঃ, ডোবালে তুমি বড়দা, আমাদের ডোবালে! নিশ্চয় এর ভেতর দুর্যোধনদার কোনো ফন্দি-ফিকির আছে! ভুঁইস্যুয় যজ্ঞ শুনে অবধি তার ওজন সাড়ে তিন পাউণ্ড ক'মে গেছে সে-খবর রাখো?

শকুনি মামা আজ হস্তিনাপুর মেলে এসে পৌঁছেছে শুনেছি। তখনই বুঝেছি এইরকমের একটা কিছু ঘটবে,—যাতে তুমি কিছুতেই যজ্ঞে আহুতি দিতে না পারো। সহদেব, শিগগির খড়ি পেতে গুনে ছাখ্, ব্যাপার কী।'

জ্যোতির্বিদ্যা শাস্ত্রে সহদেব বড়ই পণ্ডিত, তিনি খড়ি পাতিয়া গুনিয়া দেখেন সেজদার কথাই ঠিক, দুর্যোধনই কারসাজি করিয়া বিকর্ণকে কোথায় সরাইয়াছে। কিন্তু মঘার উপর অশ্লেষার ছায়া পড়িয়াছে, কাজেই কোথায় যে বিকর্ণ লুকাইয়া, কোনো জ্যোতিষীরই সাধ্য নাই গনিয়া তাহা বলিতে পারে।

কী সর্বনাশ, গোবরগণেশ শাদাশিধা দাদাকে ভুলাইয়া কুচক্রী দুর্যোধন কী ভীষণ জোচ্চুরিই না করিল! ভীম তো গদা লইয়া যাইবেই সে জোচ্চোরের মাথা ফাটাইতে। অর্জুন তাঁকে থামাইয়া বলিলেন, 'গোঁয়ার্তুমিতে কাজ নেই, বরং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এখন সত্য-রক্ষা কীভাবে হয় তাই ভাবো। আমি বলি, দ্বারকায় সখা কৃষ্ণকে একটা টেলিফোন করো, তাড়াতাড়ি গরুড়-মুখো এরোপ্লেনটায় চ'ড়ে তিনি এখানে চ'লে আস্থন। সেটা খুব ফাস্ট (দ্রুত)।'

শেষে তাহাই করা হইল। ঘণ্টাদেড়েক বাদে পঞ্চপাণ্ডব সার্চলাইট লইয়া ছাদে উঠিলেন, কৃষ্ণের এরোপ্লেন কখন আসে তাহাই দেখিবার জন্য। মাথার উপর দিয়া শত-শত এরোপ্লেন আসিতেছে যাইতেছে—কোনোটা ঢেঁকিমুখো—সেটা নারদের, কোনোটা হাঁসমুখো—সেটা ব্রহ্মার, কোনোটা ষাঁড়মুখো—সেটা শিবের, এই রকম। ইন্দ্র দেবরাজ, তাঁর নিজেরই তিন-তিনখানা এরোপ্লেন; তবে, 'দি ঐরাভাট'খানা হাতিমুখো বলিয়া হস্তিনাপুরের উপর দিয়া তার ওড়া নিষেধ।

হঠাৎ ভীম ভীমনাদ করিয়া উঠিলেন, 'ঐ যে, ঐ গরুড়মুখো দেখা যাচ্ছে!' একটু পরেই কৃষ্ণ এরোপ্লেন হইতে নামিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কী হে সখারা, আবার কোন বিপদে পড়েছ?'

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে নিয়া ড্রয়িংরুমে আসিলেন, সেখানে সমস্ত কথা তাঁকে ভাঙিয়া বলা হইল। শুনিয়া কৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, 'এই ব্যাপার, এতেই এমন ভড়কে গেছ? আমি ভাবি, না-জানি কীই বা হয়েছে! আচ্ছা, আমি সব সামলে দিচ্ছি।—আরে সুভি, ও সুভি!'

পর্দার আড়াল হইতে সুভদ্রা জবাব দিলেন, 'আমায় ডাকছ ছোড়দা?'

'হ্যাঁ, একবার তোর পাণিনি ব্যাকরণখানা নিয়ে আয় তো!'

সুভদ্রা পাণিনি আনিয়া দিলেন, কৃষ্ণ সেখানা খানিক উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'ঠিক হয়েছে, কাল ভোরেই খবর পাঠিয়ে দাও, যুধিষ্ঠির কালকের দিনের মধ্যেই বিকর্ণকে নিয়ে দুর্যোধনের কাছে হাজির হবেন।'

এদিকে দুর্যোধনের চক্রান্তের কথা হস্তিনাপুরে আর চাপা নাই, সকলেই টের পাইয়া গেছে আসল ব্যাপার কী। দুর্যোধনও আর লুকোচুরির প্রয়োজন নাই দেখিয়া নিজমূর্তি ধরিয়াছেন। বলিতেছেন, 'যুধিষ্ঠিরদা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা না রাখতে পারলে তাঁকে বনে যেতেই হবে—নেহি ছোড়েঙ্গা! হুঁ হুঁ!'

বিকাল হইবার পরই দুর্যোধনের লনে ব্যাপার কী ঘটে দেখিবার জন্য আত্মীয়-বন্ধুরা জুটিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর—কেহ আর বাদ নাই। সকলেই প্রায় দুর্যোধনের জোচ্চুরিতে চটিয়াছেন, এখন ভালোয় ভালোয় যুধিষ্ঠির সত্য রাখিতে পারিলে হয়।

সূর্য ডুবু-ডুবু, এমন সময় রাস্তায় পাণ্ডবদের দল দেখা দিলেন। সবার আগে শ্রীকৃষ্ণ, মধ্যে পাঁচ ভাই, আর অবশেষে ড্রাইভার দারুক কাপড়ে ঢাকা একখানা গোরুর গাড়ি হাঁকাইয়া আসিতেছেন। লনে আসিয়াই কৃষ্ণ বলিলেন, 'আপনারা সকলে এসেছেন, বেশ ভালোই; যুধিষ্ঠির বিকর্ণকে ধ'রে এনেছেন, দেখুন।'

সবাই নীরব নিস্পন্দ। দুর্যোধন এবং কর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—মিনিট পাঁচেক আগেও যে তাঁরা দেখিয়া আসিয়াছেন বিকর্ণ একখানা মোটর বাইকের ক্যাটালগ মাথায় দিয়া পাতালকুঠিতে ঘুমাইয়া আছে!

যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে গোরুর গাড়ির সামনেকার কাপড়খানা উঠাইয়া ফেলিলেন, আর তড়াক্ করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল একটা —গাধা!

উপস্থিত সকলে এ-উহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কেহই কিছু বুঝিলেন না। শকুনি মামা মুখ খুলিলেন সবার আগে, বলিলেন, 'বাবা কৃষ্ণ, এটা তো দেখছি একটা গাধা! এ বিকর্ণ হবে কী ক'রে? বড়জোর একে লম্বকর্ণ বলতে পারি, কিন্তু তার বেশি তো নয়।'

গাধার ডান কানে একটা ঢাকনি দেওয়া ছিল, কৃষ্ণের ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠির সেটা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল সে-কানটা নাই—একদম কাটা। কৃষ্ণ বলিলেন, সে কী কথা মামা, পাণিনির ব্যাকরণ আপনি উড়িয়ে দিতে চান? ব্যাকরণ বলছে: যার কাপড় বা বসন নেই সে বিবসন, যার রং মুছে গেছে সে বিবর্ণ; তবে যার কান নেই সে বিকর্ণ হবে না কেন? আলবৎ হবে!'

উপস্থিত সকলে একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আলবৎ হবে, আলবৎ হবে!'

তখন কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা যাঁর যাঁর পকেট হইতে এক একটা শাঁখ বাহির করিয়া দারুণ জোরে ফুঁকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ফুঁ দিলেন পাঞ্চজন্য শঙ্খে, অর্জুন দেবদত্তে, ভীম পৌণ্ড্রে, যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়ে। এমনকি, নকুল আর সহদেব পর্যন্ত বাদ দিলেন না—সুঘোষ আর মণিপুষ্পক নামে দুটা শাঁখ বাজাইলেন। সে আওয়াজে পাতালকুঠিতে বিকর্ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। শাঁখের আওয়াজ শুনিয়া ভূমিকম্প হইতেছে মনে করিয়া নিজের প্রাণটা বাঁচাইতে সে একেবারে সবার সামনে লনে আসিয়া উপস্থিত।

গন্ধচুরির মামলা

শিবরাম চক্রবর্তী

আমি নাকি কখনো হাওড়া পুলই পার হইনি, শুনে থাকি। যে-আমি কখনো কলকাতার বাইরে পা দিইনি, সেই-আমিই একবার সমুদ্র ডিঙিয়ে জাপানে গিয়েছিলাম একথা যদি বলি, তাহ'লে আমার বন্ধু ভূপর্যক রামনাথ থেকে শুরু ক'রে কেউই সেকথা বিশ্বাস করবেন না। অবশ্যি, রামনাথবাবু অবিশ্বাস করার জন্যে এখানে আর ব'সে নেই, তিনি স্বর্গপর্যটনে গেছেন, আর আমি, যদিও যাবো-যাবো করছি, এই গল্প লেখার পর তাঁর ভয়ে স্বর্গের দিকে পা বাড়াতে সহসী হবো কি না সন্দেহ। জাপানে গিয়ে যে-ধাক্কা আমি খেয়েছি, তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি না তা খাপ খায়? যদি তিনি খাপ্পা হন?

কিন্তু সত্যি বলতে, তাঁর সঙ্গে আমার ভূপর্যটনের অভিজ্ঞতা মিলে যায় বেশ। জাপানে যাওয়াটা আমার যত বড়ো ভ্রমই হোক না, সেখানে গিয়েই আমি পৃথিবী-ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছিলাম, পার্থিব স্বাদ আমার মিটেছিল। তার পরে আর হাওড়া পুলের পারে পা বাড়াবার ইচ্ছেই হয়নি।

না হোক, আমার জাপানী অভিজ্ঞতা তাঁর বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপানো। ভূপর্যটনে বেরুলে কী হয়? কী কী হয়ে থাকে? কপর্দকশূন্য হতে হয়, বাঘ ভাল্লুকের মুখে পড়তে হয়, সময়ে অসময়ে চোর ডাকাতের হাতেও যে না পড়তে হয় তা নয়। প্রাণ হারাতে হারাতে হঠাৎ দেখা যায় যে না, তা হাতেই আছে। প্রাণ হাতে ক'রেই বেড়াচ্ছি। মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া, খোয়ারের হাত থেকে

বাঁচা, বাঁচার জন্য আবার খোয়ার। এ-সবের মিঠেকড়া আস্বাদ আমিও এক-আধটু পেয়েছিলাম বইকি!

অবশ্যি, চোর ডাকাতের হাতে পড়বার সুযোগ আমার হয়নি, বাঘ ভাল্লুকের মোলাকাতও আমি পাইনি, তবে হ্যাঁ, কপর্দকশূন্য আমায় হতে হয়েছিল ঠিকই।

একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি জাপানে গিয়ে পড়লাম।

বরাত ভালো, সেখানে এক বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। ব্যবসাসূত্রে তিনি সেখানে ছিলেন। আমার কাছে তিনি বাংলা শিখতে রাজি হলেন এবং বিনিময়ে আমায় হিন্দি না শিখিয়ে বরং কিছু বেতন দিতে চাইলেন। আমার হ'লো ডবল লাভ, টাকার সঙ্গে হিন্দিও আসতে লাগলো অমনি। বিলকুল মুফৎ। টাকাটা পেলাম মুখ্যত, আর হিন্দিটা শিখলাম তাঁকে বাংলা শেখাতে গিয়ে মুখে-মুখে। থাকতাম সেই ভদ্রলোকের বাসায়, আর খেতাম কাছাকাছি এক জাপানী হোটেলে।

এই হোটেলওয়ালা বাঙালীদের দু-চোখে দেখতে পারতো না। আগে নাকি কোন্ এক বাঙালী তার আকাশ চুরি ক'রে পালিয়েছিল।

আকাশ চুরি। হ্যাঁ, আকাশ চুরি। শুনলে আকাশ থেকে পড়তে হয় বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়।

জাপানে আগে নিয়ম ছিল···অবশ্যি সে নিয়ম আর এখন নেই। সেই কীর্তিমান বাঙালীর চৌর্যবৃত্তির পর—চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে তো?—সে-কানুন পাল্টে গেছে এখন।

আগেকার আইনে জাপানে জমির মতো আকাশেরও একটা দাম ধরা হ'তো। জমির সঙ্গে তার উপরকার সমস্ত আকাশটা জমির মালিকের ইজারা নেওয়া থাকত, সেই মালিকানা তিনি জমির সঙ্গে বেচতে পারতেন। কেউ তাঁর কাছে বাড়ি-ঘর বানাবার জন্য জমি কিনতে এলে তাকে জমির দৈর্ঘ-প্রস্থের সঙ্গে উচ্চতাও কিনতে হ'তো—জমির জ্যামিতির উপর সেটা উপরি লাভ। ধরো কেউ চারকাঠা বাই

ছু-কাঠা প্লটের উপর একটা একতলা বাড়ি বানাবে—সেটা হবে উঁচুতে হাত দশেক ; সেই চৌহদ্দির ভিতর আর উচ্চতায় দশ হাতের মধ্যে বাড়িটা শেষ করতে হবে তাকে।

জমিওয়ালার এতে ভারি মজা। একতলা মাপের জায়গা একজনকে গছাবার পর দোতলা মাপের আর একজনকে, তেতলার মাপটা আবার অপর একজনকে—এই ভাবে একই চারকাঠা বাই ছু-কাঠাকে সে বারংবার বেচতে পারে—খদ্দের পরম্পরায়। জমিদারির যাকে বলে পরাকাষ্ঠা !

বাড়িওয়ালাদের বেশ অসুবিধে। মনে করো, তুমি একটা মনের মতো একতলা গ'ড়ে নিজের ঘরে আরাম ক'রে বসেছো, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আরেক জন তোমার বাড়ির উপর ভারা বেঁধে দোতলা খাড়া করতে লাগলো। শুরু হয়ে গেলো হৈ-হল্লা। এলো তাদের মিস্ত্রি মজুর, ইঞ্জিনীয়ার 'ওভারসীয়ার। ইঁট শুরকি মজুদ হ'লো—আরাম করবে কি, তোমার বাড়ির চারপাশে জো রইলো না পা ফেলবার। নড়বার চড়বার ঠাঁই রইলো না কোথাও ; কান-ফাটানো ঠাঁই-ঠাঁই শুরু হয়ে গেলো। জন-মজুরের কুচকাওয়াজের সঙ্গে ছাদ পেটানোর সেই আওয়াজ। যেতে আসতে তাদের বালির পলস্তরা পড়ছে বাড়ির মাথায়, আর খানিকটা তোমার মাথায়। চুনকামের কিছুটা বাড়ির দেওয়ালে, কিছুটা তোমার গালে।

এখন, সেই বঙ্গজ পাষণ্ডটা করেছিল কি, সেই হোটেলওয়ালার কিছু জমি কিনে একখানা একতলা বানিয়েছিল।

জমিটার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পুরোপুরিই ছিল, এক ইঞ্চিও ছাড়ে নি। কেবল উচ্চতার দিকটায় হাতখানেক ছাড় রেখেছিল। হোটেলওয়ালা যখন পরে খেপে বাড়ির উপর-ভাগটা অপরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন আর সে লোকটা মিস্ত্রী মজুর ইট কাঠ চুন সুরকি নিয়ে এসে বাড়ি তুলতে লাগলো, তখন বাঙালীটি বললেন, 'বাপু, বাড়ি তুলবে তোলো, আপত্তি নেই, কিন্তু উপরের আরো হাতখানেক জমির উপর আমার

স্বত্ব আছে, সেটা বাদ দিয়ে।' আকাশের খানিকটা সে ফাঁক রেখেছিল, সে জানতো, সেই ফাঁকের উপর আর যাই হোক, ভিৎ গেড়ে ইমারত তোলা বাতাসে কেল্লা বানাবার মতোই আকাশকুসুম হবে।

সেই ফাঁকে হোটেলওয়ালাকে সে একহাত দেখালো বটে!

আকাশের ফাঁকিতে প'ড়ে হোটেলওয়ালা কিন্তু সহজে ছাড়লো না। এ নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিলো বেশ, মামলাও বেধেছিলো, তবে শেষ পর্যন্ত সেই বাঙালীটিরই জিৎ হ'লো, দোতলা আর উঠলো না। আমার কেনা জমি যদি আমি ফেলে রাখি, কার কী? আর, আকাশের জমিন নেহাৎ শূন্য হ'লেও ন্যায্য মূল্য দিয়েই কেনা বেচা হয়েছে যখন!

সেই থেকে সেই হোটেলওয়ালা বাঙালীদের উপর হাড়ে-হাড়ে চটা। আমি খেতে যেতাম তারই হোটেলে।

হোটেলটা বেশ নাম-করা। ফার্স্ট ক্লাস চীনে রাঁধুনিরা রাঁধতো সেখানে। নামজাদা হোটেলটার দাম ছিল জেয়াদা। খানাপিনার দর বেজায়। সাধারণত বড়োলোকেরাই সেখানে খেতে যায়।

আমার কপর্দকশূন্যতার কথা বিবেচনা ক'রে বেশি কিছু খাবার আমায় সাহস ছিল না। আমি কেবল একপ্লেট ভাত নিতাম। আর বসতাম রান্নাঘরের ধার ঘেঁষে। ধারে পাওয়া যেত দেদার জিনিশ।

রান্নাঘরের থেকে নানারকমের খুশবু আসতো। কতো কী উপাদেয় রান্নার সৌরভ আসতো যে! ফ্রায়েড রাইস, মুরগির কারি, চপ, স্যুয়ে, আরো কত কী-র। কী ক'রে তার ফিরিস্তি দেবো, চোখেও দেখিনি, চেখেও দেখা হয়নি কখনো। কেবল মাছভাজার গন্ধ থেকেই চেনা জিনিসের মালুম আসতো, আঁচ পেতুম ফ্রায়েড ফিশের।

না আঁচানো পর্যন্ত গন্ধগুলোই চাখতাম। ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে জলের সঙ্গে মিকচার ক'রে খেতাম ব'সে তারিয়ে তারিয়ে। গন্ধের দৌলতে কোথা দিয়ে যে উড়ে যেতো প্লেট-কে প্লেট!

দিনের পর দিন এইরকম মাগনা খেতাম নানা গন্ধ নগদা ভাতের সঙ্গে। রান্নাঘরের ধারে।

ঘে-বয়টা পরিবেশন করতো, সে একদিন কৌতূহল-বশে আমায় শুধালো—'খালি-খালি ভাত খেয়ে তোমার পেট ভরে?'

—'ভরবে না? ভাত খেলে পেট কখনো খালি থাকে নাকি?'

—'না না, তা বলছি না। শুধু-শুধু ভাত খেতে ভালো লাগে তোমার?'

—'শুধু-শুধু কেন? ভালো-মন্দর টাক্‌না দিয়েই খাচ্ছি তো। ভালো-ভালো খাবারের খোশবাই আসছে তোমাদের রান্নাঘরের থেকে। খোশবাই মিশিয়ে আমি খাই। অ্যাণ্ড আই হ্যাভ নো নীড টু বাই দেম—দীজ খোশবাইজ।'

'—তা বটে। কিন্তু—'

—'কিন্তু আবার কিসের? স্বাদের পনেরো আনাই তো গন্ধ আসলে। লোকে ঝোল মেখে মাছ-মাংসের টুকরো দিয়ে ভাত তোলে, আমি গন্ধ মেখে খাই। আর গন্ধের জন্য তো কোনো দাম লাগে না! আর বলবো কী ভাই, তোমাদের গন্ধগুলো এইসা তোফা। তা'র এমন খাসা তার। আর গন্ধ এন্তার। এবং বিলকুল ফ্রি অব্ চার্জ!'

—'তা বটে। তবুও—'

—'জানো তো, আমার ট্যাঁক হিরোশিমার মাঠ—'আমার পকেটের সীমান্তে যে জিরো, তা অকপটে ওকে জানিয়ে দিই—আমরা বিশ্বপাট-করা বিলকুল কপর্দকশূন্য।—'তাছাড়া একটু গন্ধ পেলেই নাচবো, এটা কিছু নতুন নয় আমাদের। আমাদের হনুমানও একবার... হনুমান? ওয়ান অব্ আওয়ার হীরোজ উইথ এ বিগ্ টেইল—গন্ধে গন্ধে গোটা গন্ধমাদনই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।'

—'তাই নাকি!' ব'লে পরিবেশকটি অবাক হ'য়ে চ'লে গেলো।

কিন্তু কথাটা কি ক'রে গিয়ে কানে উঠলো হোটেলওয়ালার। সে তো রেগে কাঁই! তার পরদিনই আমাকে পাকড়ে তার সে কী চোটপাট! এতদিন ধ'রে যে বিনে পয়সায় আমি তার এতো গন্ধ খেয়েছি, তার দাম দিতে হবে আমায়।

—'আমাকে বেচলেও সে দাম উঠবে না'—সাফ তাকে ব'লে দিলাম।

মামলা উঠলো আদালতে। তিন মাস ধ'রে তার যতো খাবারের গন্ধ আমি পয়সা না দিয়ে খেয়েছি—তার খেসারতের দাবি।

অভিযোগ তার মিথ্যে নয়। মেনে নিতে হ'লো আমায়।

দু'পক্ষের কথা শুনে হাকিম হাঁকলেন—'ফরিয়াদির যুক্তি টেকসই বটে। গন্ধ তার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ব'লেই যে তার উপর তার অধিকার চ'লে গেছে তা কখনো হ'তে পারে না। খাদ্যের মতো তার গন্ধের সর্বস্বত্বও মালিক কর্তৃক সংরক্ষিত। মনে করো যদি কারো কুকুর শেকল ছিঁড়ে রাস্তা দিয়ে ছুট মারে তাহ'লে কি তার উপর থেকে তার দাবি-দাওয়া চ'লে যায়?'

হাকিমের রায় শুনে হোটেলওয়ালা তো বেজায় খুশি।

—'অতএব তার পাঁচশো টাকার খেসারতের দাবি পুরোপুরিই আমি মঞ্জুর করলাম।' ব'লে হাকিম আমার প্রতি কটাক্ষ করলেন—'কতো টাকা আছে তোমার কাছে?'

—'কতো নয়, কয়েক। কয়েক টাকা মাত্র আছে হুজুর।'

—'টাকাগুলো বাজে?'

—'বাজে কি আসল তা আমি বলতে পারবো না। আমাদের ভারতীয় টাকা তো নয়। আপনাদের জাপানী ইয়েন।'

—'মানে আমি বলছিলাম কী, টাকাগুলো বাজে তো?' বললেন হাকিম: 'তা'হলে টাকাগুলোকে ঠন্ ঠন্ ক'রে বাজাও। পাঁচশো বার। গুণে গুণে পাঁচশো বার, তার বেশি নয় কিন্তু।'

এ পকেট ও পকেট হাতড়ে ফুল্লে একটি মোটে টাকা বেরুলো। হাকিম বললেন, 'ওতেই হবে। বাঁজিয়ে যাও। পাঁচশো বার।'

কথায় বলে, মানি টকস্। টাকায় কথা বলে। আমি টকাৎ ক'রে টাকাটা ট্যাঁক থেকে বার করেই-না বাজাতে শুরু করলাম। ঠন্ ঠন্ ঠনাঠন্...

সেটি একটি টাকাই। কিন্তু সেই একই অনেক। একাই একশো। একশো নয়, পাঁচশো।

পাঁচশোবার বাজানো হ'লে হাকিম বললেন, 'ব্যস, আর না।' ব'লে তিনি হোটেলওয়ালার দিকে ফিরলেন, 'তোমার গন্ধের দাম এই টাকার আওয়াজ দিয়ে শোধ হ'য়ে গেলো। আদালতের চূড়ান্ত রায় হ'লো এই। তোমার পুরো খেসারত তুমি পেয়ে গেলে। এখন খুশি হ'য়ে বাড়ি যাও।'

আমিও খুশি হ'য়ে বাড়ি ফিরলাম। নাকে ক'রে যা নিয়েছিলাম, ওর কান ধ'রে—না না, ওর কানে তা ধ'রে দিলাম।

গন্ধ-চুরির খেসারত এইভাবে ঠনৎকারে শুধে জাপানের মাটির মায়া কাটালাম। ফিরে এলাম কলকাতায়। আমার ঠন্‌ঠনেয়।

আমার নাকে খৎ। আমার ভূপর্যটনের সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপর আর হাওড়া পুলের ওপার হইনি।

ফের আবার নাকাল হ'তে যায় ?

ভোলানাথের আত্মবিলাপ

রবীন্দ্রলাল রায়

ভূতের গল্প লিখতে বসেছিলাম—ভূতুড়ে গল্প নয়, খাঁটি ভূতের গল্প—ভেজালহীন ভূতের গল্প লিখতে বসেছিলাম। লেখার আগে একটু ধ্যানে বসলাম—ভূতেদের রাজা ভূতনাথের ধ্যানে; যদি কিছু শক্তি নামে।

শক্তি হয়তো নামছিল, কিম্বা স্বয়ং ভূতনাথই নামছিলেন হয়তো; কিন্তু সব মাটি ক'রে দিলেন আমাদের পাড়ার দাহু, দা'ঠাকুর এসে। চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম, অবশ্য ব'সে নয়, শুয়ে; এমন সময় কানে এল, 'ওরে আদি কোথা রে?'

ধ্যান গেলো ভেঙে। দাহুকে বললাম, 'সর্বনাশ করলেন দা'ঠাকুর।'

দাহু একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, 'কেন রে, কী করলাম?'

বললাম, 'ধ্যানে বসেছিলাম—ধ্যানে শুয়েছিলামই বলা উচিত, মহাদেবের ধ্যানে।'

'মহাদেবের ধ্যানে!' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন দাহু।

সব কথা খুলে বলি দাহুকে।

দাহু একটু হেসে বললেন, 'ওরে সে কি আর হয় অত সহজে? মহাদেবও আজকাল চতুর হ'য়ে গেছেন রে, চতুর হ'য়ে গেছেন। অত সহজে আর ভোলেন না। জীবনে নেড়া যদি একবারের বেশি না ঠকেন, মহাদেব হাজার হ'লেও দেবতা—তিনিই বা হু'বার ঠকবেন কেন?'

বুঝলাম দা'ঠাকুর মৌতাতের মাথায় আছেন; গল্প লেখার চেয়ে

গল্প শোনার জন্য বেশি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহাদেব ঠকলেন কবে? আর মহাদেবের সে ঠকার গল্পই বা আপনি জানলেন কেমন ক'রে?'

দাদু বললেন, 'তোদের ভজুয়াটা গেল কোথায়? এক ছিলিম তামাক দিতে বল্ না।'

তামাক এল, দাদু একটা টান দিয়ে বললেন, 'শোন্। একদিন সমস্ত যজমানের বাড়ি ঘুরে নিরাশ হ'য়ে বাড়ি ফিরেছি, এক পয়সা কারও কাছে পাইনি। ভাবলাম, লক্ষ্মীপুজো করি; কিন্তু লক্ষ্মীপুজো করবো কি—দুটো পয়সাও হাতে নেই। কী করি—এদিকে তোদের দিদিমার গঞ্জনাও আর সহ্য হয় না। ঠিক করলাম হয় বিবাগী হ'য়ে যাব আর না হয় আত্মহত্যাই করবো। দুটোর একটাও করতে হ'লো না, হঠাৎ খেয়াল হ'লো, মহাদেবের পুজো করলেই হয়। মহাদেব অত্যন্ত ভালো মানুষ, দুটো বিল্বপত্র আর একটু গঙ্গাজল হ'লেই হ'লো। সহজেই মিললো। ঘড়ায় ছিল গঙ্গাজল, গাছে ছিল পাতা; দুটির সংযোগে পুজো শুরু করলাম মাটির শিব তৈরি ক'রে। ভাবলাম মহাদেব খুশি হ'লেই তাঁর কথায় মা লক্ষ্মীও খুশি হবেন নিশ্চয়—মহাদেব যাই হোন লক্ষ্মীদেবীর বাবা তো? খানিকক্ষণ একমনে পুজো করতেই দেখি—ঘরের দরজার কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। ভালো ক'রে লক্ষ্য করতেই দেখি, স্বয়ং মহাদেব। অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালাম; বললাম ব্যস্তভাবে—"আরে প্রভু যে। আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন। এখানে দাঁড়ালেন কেন?"

'মহাদেব একটু লজ্জিত ভাবেই বললেন—"না, না, থাক, থাক।" মুখে তাঁর সে সদাপ্রসন্ন ভাব আর নেই, কী রকম যেন মুষড়ে রয়েছেন মনে হ'লো। বললেন, "ছাখো বাবা! কেউ ডাকলে না এসে থাকতে পারি না, কিন্তু বর দিতে বা কোনো সাহায্যই আর কাকেও করতে পারি নে।"

'আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন প্রভু?"

'প্রভু বললেন, "বেকুব বনে যাওয়ার ভয়ে। জানো তো, দেবতা-মহলে আমার শাদাশিদে ব'লে একটা দুর্নাম আছে, মানুষেও যে না বলে তা নয়। ও-সব কথায় কান দিতাম না এতদিন। কিন্তু, সেবার সামান্য একটা মানুষের কাছে ও-রকম বেকুব ব'নে যাবার পর আর ত্রিসংসারে মুখ দেখাতে পারি নে।"

'একটু চুপ ক'রে থেকেই আবার তিনি শুরু করলেন—গোঁদলপাড়া জানো? গোঁদলপাড়া? জানো না বোধহয়। যাক, গোঁদলপাড়া ব'লে একটা জায়গায় লক্ষ্মীকান্ত ব'লে একটা লোক ছিল। অত বড়ো বদ্ লোক সংসারে আর দুটো নেই। ব্রহ্মা যে কেন ওকে সৃষ্টি করেছিলেন তার ঠিক নেই—ওকে সৃষ্টি করা নিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে আমার ঝগড়াই হ'য়ে গেছে সেদিন। যাক, শোনো। ও লোকটার নিজের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিলো না—অথচ ওরই আত্মীয় যারা তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভালো। ওর ছোটো বাড়ির সামনে একটু দূরেই তাদের প্রকাণ্ড বাড়ি—অজস্র টাকাকড়ি, প্রচুর সম্পত্তি। তার জন্য তো আমি দায়ী নই। ও তো লক্ষ্মীর ডিপার্টমেন্ট। আর তা ছাড়া ও যা পাজি, লক্ষ্মীর বিরূপ হওয়া আশ্চর্য নয়। একই পুরুতঠাকুর বড়ো বাড়িতেও পুজো করে, ওর বাড়িতেও পুজো করে—লক্ষ্মীপুজো। একদিন ও বললে—"পুরুতঠাকুর! আচ্ছা আপনি তো ও-বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করেন, আমার বাড়িতেও লক্ষ্মীপুজো করেন। ওদের ধন সম্পত্তির সীমা নেই অথচ আমার সেই যে অবস্থা সেই অবস্থাই রইল। এর মানে কী? আপনি নিশ্চয় ভালো ক'রে মন্ত্র পড়েন না।"

'পুরুতঠাকুরটিও কম বিটকেল নয়। সে বললে, "আদৎ কথা কী জানো, বাবা? আজকাল দেবতারাও গেছেন বদলে। মন্ত্র বা ভক্তিতে ভোলেন না—ঘুষ চান, ঘুষ। ষোড়শোপচারে পুজো দাও, তবেই খুশি। তুমিও একদিন বেশ খরচ ক'রে পুজো করো, দেখবে, লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হবেন।"

'লক্ষ্মীকান্ত বললে, "কত টাকা লাগবে?"

'পুরুতঠাকুর দেখলে যে লক্ষ্মীকান্তের স্ত্রীর গায়ে যে গহনা আছে তা বিক্রি করলে শ'খানেক টাকা হ'তে পারে। একটু যেন ভেবে বললে, "এই শ'খানেক টাকা হ'লেই হবে।"

'লক্ষ্মীকান্তও তেতে গেল—বললে, "ঠাকুর, ঠিক বলছো হবে ?"

'পুরুতঠাকুর নির্বিকারভাবে বললে, "নিশ্চয়ই হবে।" মনে মনে ভাবলে, ছাই হবে, সে শ'খানেক টাকার ষোড়শোপচার আমার বাড়িতে আসবে—পুরোহিত যখন আমি।

'লক্ষ্মীকান্ত তার গিন্নির গায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি ক'রে শ'খানেক টাকা জোগাড় করলো। গিন্নিকে বোঝালে—এই একশো টাকার গহনা দিলে হাজার-হাজার টাকার গহনা হবে—দেখবে।

'ষোড়শোপচারে পুজো হ'লো শ'খানেক টাকা খরচ ক'রে। শ'খানেক টাকার দ্রব্য উঠল গিয়ে পুরুতঠাকুরের বাড়ি; লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মীর দয়াও আর মিলল না। দিন যায়। লক্ষ্মীকান্ত উঠল ক্ষেপে। একদিন পাগলের মতো গিয়ে পুরুতঠাকুরের হাত ধরলো চেপে। চোখ রাঙিয়ে বললে, "কই ঠাকুর, অবস্থা ভালো হ'লো কই আমার ? মজা পেয়েছ। নিজের অবস্থা ভালো করার মতলব তোমার আমার ঘাড় ভেঙে, না ?"

'পুরুতঠাকুর ভয় পেয়ে বললে—"বাবা, রাগ ক'রো না। এখনো যে অনেকটাই বাকি রয়েছে।"

লক্ষ্মীকান্ত চোখ পাকিয়ে বললে—"কী বাকি রয়েছে ?"

'পুরুতঠাকুর বললে—"পুজো যা করবার তা তো করেছি আমি, এবার তোমার করবার পালা। বড়ো শক্ত—অথচ সেটা না করলেও লক্ষ্মী সদয়া হবেন না।"

'"কী করতে হবে আমায় বলুন"—লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাসা করে মরীয়া হ'য়ে।

'পুরুতঠাকুর বললে—"লক্ষ্মী তো খুশি হয়েছেন, এখন দরকার মহাদেবকে খুশি করা। বড়ো বাড়ির বাবু এই অমাবস্যা থেকে

এক পক্ষ ধ'রে নির্জলা উপবাস ক'রে মহাদেবের ধ্যান করবেন। তোমাকে তার চেয়েও বেশি করতে হবে, বাবা। ঐ বনের মাঝে যে মন্দির আছে সেই মন্দিরের মধ্যে যে মহাদেব আছেন, সেই মহাদেবের ধ্যান করতে হবে তোমাকে নির্জলা উপবাস ক'রে। ওবাড়ির বড়ো বাবু পনেরো দিন ধ্যান করবে, তুমি এক মাস করো যদি তা'হলে বড়ো বাবুর যা মিলবে তোমার নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি মিলবে মহাদেবের বরে।"

'এই কথা ব'লেই মহাদেব বললেন—"দেখ মজাটা! ব্যাটা পুরুত দিলে আমার ঘাড়ে ফেলে! ঐ শয়তানটাকে আমার উপর ভর করিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত।"—বলে আবার শুরু করলেন—

'যাক, শোনো তারপর আমার দুর্দশার কাহিনী।

'পুরুতঠাকুরের কথা শুনে লক্ষ্মীকান্ত প্রথমটায় যেন বেশ একটু ঘাবড়ে গেল। খানিক পরে হঠাৎ মরীয়া হ'য়ে উঠলো, বললে—"আচ্ছা ঠাকুর! তাই করবো, কিন্তু তার পরেও যদি না আমার বাসনা পূর্ণ হয় তাহ'লে তোমায় খুন করবো—সত্যিকারের খুন করবো—তা সে ব্রহ্ম-হত্যার পাতকে পড়তে হয় সেও রাজি—"

'"পুরুতঠাকুর মনে মনে ভাবলো, এখন তো বাঁচি, বাবা! পরে যা হবার তা হবে। ও ব্যাটা এক মাস নির্জলা উপবাস ক'রে কি আর বেঁচে ফিরবে ঐ মন্দির থেকে? ওখানেই ও ব্যাটাকে মরতে হবে শেষ পর্যন্ত।

'"যাক লক্ষ্মীকান্ত তো ঢুকলো আমার ঐ মন্দিরে। সত্যি-সত্যিই শুরু করলো আমার ধ্যান করতে—স্রেফ নির্জলা উপবাস ক'রে।" ব'লে আবার আমাকে মহাদেব বললেন, "কী মুস্কিল বলো তো আমার হ'লো! সামান্যতে আমি খুশি হই ব'লে অন্য দেবতাদের কাছে আমায় কী লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয় তুমি তা জানো না। আর এ-ক্ষেত্রে একটা লোক জল পর্যন্ত স্পর্শ না ক'রে ধ্যান করবে আমার—আর আমি থাকবো নির্বিকার হ'য়ে—এ কী ক'রে সম্ভব হয়? যাই হোক, মনে-মনে সঙ্কল্প করলাম, কিছুতেই মনকে নরম হ'তে দেবো না। তা ছাড়া এও ভাবলাম, ও কি

আর একমাস ধ'রে সত্যিই পারবে নির্জলা উপবাস ক'রে ধ্যান করতে ? কিন্তু আশ্চর্য ! সত্যিই ও সমানে চালাতে লাগলো নির্জলা উপবাস ও ধ্যান। মনটা আমার গলে-গলে অবস্থা হ'য়ে এসেছে, তবুও বহু কষ্টে সামলে আছি। গোল বাধালো তোমাদের ঐ লক্ষ্মী। জানো তো কেউ না খেলে মেয়েদের অবস্থা কী হয় ? লক্ষ্মী আমাকে সমানে খোঁচাতে লাগলো—বাবা, লোকটা যে ম'রে যাবে ; যা হয় একটা কিছু করো !"

'আমি বললাম—"মরে মরুক ! ওর মতো লোকের মরাই ভালো। ব্রহ্মার যেমন কাণ্ড, ঐ রকম একটা পাষণ্ড সৃষ্টি করার অর্থ কী আমি বুঝি না !"

'"লক্ষ্মী নাছোড়বান্দা—'না বাবা, তুমি যাও, নইলে লোকটা যে ম'রে যাবে !"

'আমি বললাম—বেশ বিরক্ত হ'য়েই বললাম, "তা অতো যদি দয়া তো তুইই যা না। ও তো আদতে চায় তোরই কৃপা !"

'লক্ষ্মী বললে—"ও তো জীবন পণ ক'রে আমাকে ডাকছে না—ডাকছে তোমাকে। আমাকে না ডাকলে যাই কী ক'রে বলো ? দেবতাদের আইনে বাধে যে !"

'লক্ষ্মীর বকবকানি আর সহ্য করতে না পেরে গেলাম ব্যাটার কাছে। মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোমরা যাই বলো—হাজার হ'লেও দেবাদিদেব মহাদেব তো আমি, একটা জ্যোতি আছে তো আমার ! মন্দিরটার মাথা আলো হ'য়ে উঠলো খানিকটা। আলো হ'তে লক্ষ্মীকান্ত মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। আমাকে দেখে ভক্তি হওয়া তো দূরে থাক খেঁকিয়ে উঠে বললে—"কে হে তুমি অর্বাচীন ?"

'আমি বললাম, "আমি দেবাদিদেব মহাদেব—"

'ব্যাটা শয়তান বিশ্বাস করলে না হে ! আমার এই শাদাশিদে পোশাক দেখে বিশ্বাসই করলে না যে আমি মহাদেব। শুধু বিশ্বাস করলো না নয়—রেগুলার ইনসাল্ট করলে আমাকে। বললে, বেশ

তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে একটু করুণার সঙ্গেই বললে—"তুমি আমাকে কী দেবে বাবা? আমার তো পরনে তবু একখানা কাপড় আছে, কিন্তু তুমি যে স্রেফ একটা কোপনি প'রে আছ! তুমি এক কাজ করো—আমার ট্যাঁকে একটা আধুলি রয়েছে নিয়ে যাও, স্বর্গে যাওয়ার সময় একখানা বড়ো দেখে গামছা কিনে নিয়ো পরবার জন্যে। কাপড় কিনে দেবার মতো পয়সা নেই, কী করবো বলো!"

'পাষণ্ডটার কথা শুনে সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে উঠলো—ভাবলাম দিই ব্যাটাকে ভস্ম ক'রে। কিন্তু তক্ষুনি মনে হ'লো, ভস্ম করলে লক্ষ্মীর কান্নায় পাগল হ'য়ে উঠতে হবে, আর তা ছাড়া তোমরাও তো বাপু ভালো নও খুব; কোনোও খোঁজ-খবর নেবে না, শুধু চিরকাল দোষ দেবে যে ধ্যানরত ভক্তকে মহাদেব করলেন ভস্ম! যাক—শেষ পর্যন্ত ওটাকে বোঝালাম কোনও রকমে যে ক্ষমতা আছে আমার বর দেওয়ার। বললাম—"কী চাস, বল তুই!"

'ও বললে—"যা চাইব তাই দেবে প্রতিজ্ঞা করো।"

'বুঝলাম ব্যাটার মতলব খারাপ। বললাম, "ছাখ, তুই যা চাইবি নিজের সুখ সুবিধার জন্য সব দেব, কিন্তু হিংসুটেগিরি চলবে না। তুই যা চাইবি তোর অদৃষ্টে তাই হবে কিন্তু ঐ বড়ো বাড়ির ওদেয় দ্বিগুণ হবে তার।" ব'লে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম। ভাবলাম, খুব জব্দ করেছি, এসো বাছাধন দেখি এবার!

'ও শয়তানটা প্রথমটা একটু মুষড়ে পড়ল মনে হ'লো—তারপর হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল, বললে, "আমার অদৃষ্টে যা হবে ওদের বাড়ির সকলের—দাসদাসীর পর্যন্ত সকলের হবে তার দ্বিগুণ?"

'আমি তেতে গেলাম, বললাম—"হ্যাঁ, সকলের।"

ও ব্যাটা বললে কী জানো? বললে—"ঠাকুর, বর দাও—কাল সকাল হওয়ার আগে আমার বাড়ির চারিধারে ত্রিশ হাত চওড়া যেন এক গভীর জল-ভরা খাদ হয় আর আমার যেন একটি চক্ষু কানা হ'য়ে যায়।"

'বললাম—"তথাস্তু।" প্রথমটায় বুঝিনি ব্যাটার এ বর-প্রার্থনার অর্থ কী। বুঝলাম পরদিন সকালেই।

'সকাল হ'তেই ওবাড়ির সকলের, দাসদাসীর পর্যন্ত হ'য়ে গেলো দুটি চক্ষু অন্ধ। ওদের বাড়ির কেউই কিছু বুঝতে পারলো না প্রথমটায়। চোখে হঠাৎ কেউই কেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার কোনো কারণই কিছু খুঁজে পেল না তারা। কাছেই একজন ডাক্তার ছিল। তাকে ডেকে আনবার জন্য একজন চাকরকে পাঠানো হ'লো; সে কোনো রকমে হাতড়ে-হাতড়ে গেল, কিন্তু সে আর ফিরলো না। আর একজন গেলো, সেও ফিরলো না। এমনি ক'রে একে-একে সমস্ত দাসদাসী, ছেলেমেয়ে, বাড়ির বাবুরা, এমনকি বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত সকলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ডাক্তারের বাড়ি কোনো রকমে হাতড়ে-হাতড়ে। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ি যাওয়ার আগেই প্রত্যেকেরই মৃত্যু ঘটলো ঐ খাদের মধ্যে প'ড়ে। বেচারারা কী ক'রে জানবে বলো যে রাতারাতি তাদের বাড়ির চারপাশে ষাট হাত চওড়া একটা খাদ তৈরি হ'য়ে গেছে!

'যাই হোক, এরা তো সবাই গেলো মারা। আর তোমাদের মানুষের রাজত্বের আইন অনুসারে ওদের আত্মীয় ব'লে ঐ শয়তানটাই হ'লো ওদের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী; ওর কেবল একটা মাত্র চোখ গেলো, আর কিছুই হ'লো না। নিজের বাড়ির পাশের খাদও পার হ'লো তার উপর তক্তা ফেলে, আর ঐ বড়ো বাড়ির চারপাশের খাদ বুজিয়ে নিলো মাটি ফেলে। ব্যস, আমাকে স্রেফ বেকুব বানিয়ে দিলে হে!

'লক্ষ্মীকে গিয়ে বললাম—"দেখলি, তোর আবদারের জন্যে একটা পরিবারকে নির্বংশ করে এলাম, আর তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ঐ ব্যাটা শয়তানটা হ'লো ওদের সমস্ত সম্পদের অধিকারী!·· এ আফসোস আমার কোনো দিনই যাবে না—ছিঃ ছিঃ এ কী করলাম!"'

দা'ঠাকুর বললে—'আমার মুখে অজানতে বুঝি একটু হাসি বার হ'য়ে এসেছিল—ভোলানাথের এই আত্মবিলাপ শুনে। মহাদেব সে

হাসি দেখে মহা খাপ্পা হ'য়ে উঠেছেন দেখি। চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমরা তো হাসবেই। আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতে পারতে ব্যাপারটা। স্বর্গে টেঁকা দায় হ'য়ে উঠছে আমার। সামনে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু আড়ালে সমস্ত দেবতারা, বিশেষত ঐ ফিচকে দেবতাগুলো এমন মুখ টিপে-টিপে ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসে আমার এই দুরবস্থা দেখে যে আমার ইচ্ছে করে এক-এক সময় ওদের সব ভস্ম ক'রে দিই—' বলতে-বলতে মহাদেবের চোখে জল এসে গেল প্রায়।

আমি তাঁর অবস্থা দেখে বললাম—"থাক প্রভু। আমার আর ঐশ্বর্যে দরকার নেই। আপনি এখন আসুন তাহ'লে।" মহাদেব একটু যেন লজ্জিতভাবেই অন্তর্হিত হলেন।'

গল্প শেষ ক'রেই দাদু বললেন—'কাজেই ও ভূতনাথকে ধ্যান ক'রে লাভ হবে না দাদু!'

আমি বললাম—'হয়েছে বৈকি দাদু! ধ্যান করছিলাম ব'লেই তো শুনলাম তোমার কাছে ভোলানাথের এ আত্মবিলাপের কথা—এইটাই পাঠিয়ে দিই এবার সম্পাদক ভায়ার কাছে।'

দাদু বললেন—"ওরে চোর, আমার এ গল্প তুই ছাপিয়ে নিজে নাম করতে চাস?'

আমি বললাম—'বিশ্বাস করুন দাদু, গল্পের মধ্যে আপনার নামই থাকবে—আমি শুধু হবো লিপিকার। রাজি তো?'

দাদু খুশি হয়ে বললেন—'আচ্ছা, তাহ'লে রাজি।'

মিন্নুর নতুন জুতো

বুদ্ধদেব বসু

মা বললেন, 'তুই এতো বড়ো হলি মিন্নু, দু-দিন বাদে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবি, এখনো তোর এ-সব অভ্যাস গেলো না !'

মিন্নু কাকুতি ক'রে বললে, 'থাক না মা, থাক।'

'শিয়রে জুতো নিয়ে আবার শোয় কে রে ?'

'আহা—একদিন পরলেই তো পুরোনো হ'য়ে যাবে—তারপর তো আর বিছানায় তুলতে পারবো না !' ব'লে জুতোজোড়াকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

'যা খুশি কর !' ব'লে মা বেরিয়ে গেলেন।

ধবধবে শাদা বিছানার উপর জুতোজোড়াটি রেখে মিন্নু মুগ্ধ চোখে রূপ দেখতে লাগলো। বাবার সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়ে একটু আগে কিনে এনেছে। দাম একটু বেশি নিয়েছে হয়তো, কিন্তু জুতোজোড়াটি সত্যি সুন্দর! সোনালি চামড়া, টুকটুকে লাল হীল, আঙুলের দিকটায় অভিনব ধরনে জাফরি কাটা—উঃ, সেই মাইসোর জর্জেটখানার সঙ্গে পরলে যা মানাবে ! কাল বিকেলেই এক বন্ধুর জন্মদিনে তার নিমন্ত্রণ আছে—ঐ শাড়ির সঙ্গে জুতোজোড়া কালই সে প'রে দেখতে পারবে। কথাটা ভাবতে তার খুব ভালো লাগলো—আবার লাগলোও না। একদিন প'রে বেরুলেই তো জুতোটা ময়লা হ'য়ে যাবে, পুরোনো হ'য়ে যাবে—পরে যতই যত্ন নিক, এই টাটকা টুকটুকে আনকোরা ভাবটা তো আর থাকবে না !

শুধু জুতো কেন, সব জিনিশই তা-ই। যতক্ষণ দোকানে আছে,

ততক্ষণই চকচকে ঝকঝকে, যেই বাড়ি নিয়ে এলে, একটিবার ব্যবহার করলে, অমনি পুরোনো হ'য়ে গেলো। মীনুর জীবনে এই এক মস্ত আক্ষেপ—জিনিস কেন পুরোনো হয়? অমন যে গোল-গোল রামধনুর মতো চুলের রিবনগুলো তারই বা দু-দিন পরে কী চেহারাই হয়! চিরুনি বলো, চামচে বলো, রেশমি-শাড়ি-পরা বড়ো-বড়ো ডল-পুতুল বলো, চিকচিকে কাগজে মোড়া ছবিওলা গল্পের বই বলো, যত সব জেল্লাওলা ভালো-ভালো বাহারে জিনিস—সবই দেখতে-দেখতে ম্যাটমেটে বিচ্ছিরি নোংরা হ'য়ে যায়, ভাবতে কান্না পায় মিনুর। এমন কেন হয়? এমন জিনিস কি হয় না, যা চিরকাল নতুন থাকে? দোকান থেকে জিনিস কিনে এনে মিনুর ব্যবহার করতেই ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে সব আলমারিতে তুলে সাজিয়ে রাখে। আর রোজ একটু একটু ক'রে ত্যাখে। নতুন জুতো কিনলে তো কথাই নেই, কয়েক দিন বিছানা থেকেই নামাবে না, তারপর প্রথম যেদিন প'রে বেরোবে, সেদিন খুব ফুর্তিও হয়, আবার বড্ড মন-খারাপও হ'য়ে যায়। প'রে বেরোলেই তো জুতো ময়লা হ'য়ে যাবে, আবার প'রে যদি না-ই বেরোবে তাহ'লে আর নতুন জুতো কেনা কেন? কী মুশকিল!

এ জুতোজোড়াকে সে সাতদিন অন্তত বিছানাতেই শুইয়ে রাখতো, কিন্তু পরের দিনই তপতীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ, এটা প'রতে প্রাণ চায়ও না, অথচ না প'রেও যে পারবে না তাও মনে মনে জানে। পরের দিন সোনালি-পাড়-বসানো মাইসোর জর্জেটখানা প'রে সোনালি রঙের নতুন জুতো পায়ে দিয়ে সে নিমন্ত্রণে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলো—উঃ উড়িয়ে নিচ্ছে একেবারে!

তপতীদের বাড়ি কাছেই। হরিপদকে নিয়ে সে রাস্তায় বেরোলো। খানিক আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে—তাদের বাড়ির ঠিক সামনে ফুটপাতের একটা অংশ বাঁধানো নেই, সেখানে ঘাসে জলে কাদায় একাকার

হ'য়ে গেছে। যেদিক দিয়েই ঘুরে যেতে চায় কাদা এড়ানো যায় না, লাফ দিয়ে পার হ'তে পারতো কিন্তু দামি জর্জেটের কথা ভেবে সেটাও সাহস হ'লো না। মিনুর রীতিমতো কান্না পেলো। জুতোটায় কাদা না লাগিয়ে কোনো উপায় কি নেই? আহা সে যদি হাওয়ার উপর দিয়ে চলতে পারতো!

পা পর্যন্ত লোটানো শাড়িটা এক হাতে তুলে ধ'রে কাদা পার হবার জন্য সে একটি পা তুললো। সঙ্গে-সঙ্গে তার আর-একটি পাও শূন্যে উঠে গেলো। মিনু অবাক হয়ে ভাবলে—'এটা কেমন ক'রে হ'লো? মানুষের ছু'পা তো একসঙ্গে শূন্যে উঠতে পারে না। লাফাবার সময় অবশ্য ওঠে, কিন্তু তাও তো—এ কী! আমার হাতের কাছে আমার দোতলার ঘরের জানলাটা যে। মিনু হাত বাড়িয়ে জানলাটা ধরতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির ছাদ তার পায়ের তলায় এসে প'ড়েছে। সে লাফিয়ে নামতে গেলো, কিন্তু কই—ছাদটা বরং আরো তলায় নেমে গেলো যেন। তবে কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মিথ্যে?—ওমা! গাছগুলোর মাথায় মাথায় বৃষ্টির জল কেমন সুন্দর রোদে চিকচিক করছে! এমন তো কখনো দেখিনি! তবে কি সত্যি-সত্যি আমি শূন্যে উঠে যাচ্ছি?

মিনু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তাদের রাস্তার ছু'দিকে সারি-সারি ছাদ আর রাস্তার মাঝখানে হরিপদ হাঁ ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে-দেখতে হরিপদ ছোট্ট এতটুকু হ'য়ে গেলো।

'—নাঃ,—নিচের দিকে আর তাকাবো না,' মিনু ভাবলে, 'হাত-পা কেমন শিরশির করে। কে জানে, মাথা ঘুরে হয়তো প'ড়েই যাবো, এখানে আবার হাতের কাছে ধরবার মতো কিছুই নেই।' কিন্তু তখুনি তার মনে পড়লো যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি মিথ্যা—অন্তত তার পক্ষে এখনকার মতো মিথ্যা—যতই মাথা ঘুরুক, প'ড়ে সে কিছুতেই যাবে না। তখন সে আর-একবার নিচের দিকে তাকালো। ওরে বাবা—কোন্ পাতালে প'ড়ে আছে কলকাতা শহর! কত্তটুকু-টুকু সব

বাড়ি! ঐসব বাড়িতে আমরা থাকি নাকি? আর ঐ যে ছোট্ট একটা রুপোলি ফিতে চিকচিক করছে, ওটা কী? ঐ বুঝি গঙ্গা? মিন্নুর এত মজা লাগলো যে সে হী-হি ক'রে হেসে উঠলো।

অমনি কে একজন তার কানের কাছে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'কী গো, অত হাসির কী হয়েছে?' মিন্নু মুখ তুলে দেখলে খুব গম্ভীর চেহারার একটা বুড়ো চিল তার সঙ্গে-সঙ্গে উড়ে উড়ে চলেছে।

মিন্নু হাসতে হাসতে বললে, 'কলকাতা শহরটা কী মজার দেখাচ্ছিলো!'

'মজার! কই, আমি তো এতে মজার কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। শহর-টহরগুলো তো এইরকমই দেখায়। উঃ, মানুষগুলো পারেও ঘিঞ্জি নোংরার মধ্যে থাকতে। ওয়াক্ থুঃ!'

মিন্নু দেখলে বুড়ো চিলের মেজাজটা সুবিধের নয়, তাই তাকে খুশি করবার জন্য বললে, 'সেইজন্যেই তো শহর থেকে পালিয়ে এলুম। এখানে সবই কেমন ঝকঝকে তকতকে—ধুলো কাদা নোংরা কিছু নেই। এক বৃষ্টি এলেই যা মুশকিল। জুতো-টুতো সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

'মুশকিল কিসের? বৃষ্টির উপরে উঠে গেলেই হয়! আর জুতোর কথাই বলো, বাছা, ও তো তোমার কোনো কাজে লাগবে না!'

'তাই তো দেখছি।' মিন্নুর মনে পড়লো যে এতক্ষণ তপতীদের বাড়িতে সবাই হয়তো এসে গেছে, কত গল্পই না করছে ওরা, সামনে ভালো ভালো খাবার সাজানো—তপতীর মা যা চমৎকার আইসক্রীম করেন! মিন্নু কোথায়? মিন্নু এলো না? মনে করা যাক এক্ষুনি এই মুহূর্তেই সে তপতীদের ড্রইং রুমে গিয়ে ঢুকেছে, সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলো, এই যে মিন্নু! এতো দেরি করলি! তপতী তার কাছে এসে হাত ধরে বললে, তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই! তারপর পায়ের দিকে তাকিয়ে......

মন-খারাপ হ'য়ে গেলো মিন্নুর। জুতোটা কাদা থেকে বাঁচাতে গিয়ে জুতোটাকেই মাটি ক'রে দিলে। কেউ যদি না-ই দেখলে, যদি

প্রশংসাই না করলে, তাহ'লে আর একটা ভালো জিনিস প'রে লাভ কী, বলো!

'আচ্ছা, আপনি কি এখন নিচে নামবেন?'

'আমি! নিচে নামবো! হঃ-হঃ!' হাসি আর কাশির মাঝামাঝি একটা শুকনো খটখটে আওয়াজ ক'রে উঠলো বুড়ো চিল। 'আমি যাচ্ছি নৈনিতালে ঈগল-খুড়োর বাড়িতে। বাচ্চা ভেড়ার চোখের চাটনি খাবার নিমন্ত্রণ। হঃ-হঃ!'

'কেমন ক'রে নিচে নামতে হয় ব'লে দিন না একটু!'

কিন্তু, সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বুড়ো চিল শোঁ-ও ক'রে বাঁ দিকে বেঁকে নৈনিতালের দিকে চ'লে গেলো। মিনু মনে-মনে ভাবলে, লোকটা ভারি অভদ্র তো! কাছাকাছি আর-কোনো পাখি দেখতে পায় কি না সেই আশায় সে চারদিকে তাকালে, কিন্তু না, কোথাও কিচ্ছু নেই। বিকেলের আলোয় মস্ত নীল আকাশ ঝলমল করছে। এত সুন্দর, যে দেখে সত্যি বিশ্বাস হয় ঐখানেই কোথাও স্বর্গ আছে। কিন্তু স্বর্গে যাবার এত বড়ো সুযোগও সে ছেড়ে দিতে রাজি যদি সে কোনোরকমে এখন বাড়ি ফিরতে পায়। কিন্তু কেমন ক'রে ফিরবে? উপরের দিকে সে উঠছে তো উঠছেই। এখন তার পায়ের তলায় কিছু দেখা যায় না, আকাশ ক্রমেই গাঢ় নীল হ'য়ে আসছে, হাওয়াটা ঠাণ্ডা। খানিক পরেই তো সন্ধে হ'য়ে যাবে, তখন? মিনুর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। নিজেকে সাহস দেবার জন্য সে বলতে লাগলো, 'ভয় কিসের? জায়গাটা তো বেশ ভালোই, তবে খিদে পেলে কী খাবো সেটা ভাবনার কথা বটে। যাকগে, যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে; উঠতে যখন আরম্ভ করেছি তখন এক জায়গায় থামবোই; আর থামতে যদি পারি তাহ'লে ফের ফিরতেও পারবো।'

মনে-মনে সে এই ধরনের যুক্তি আঁটছে, এমন সময় মোটাসোটা কালোকোলো হাতির মতো একখানা মেঘকে তার দিকে উড়ে আসতে

দেখলে। মেঘ তার কাছে এসে গুরুগর্জনে বললে, 'উঠে পড়ো, আমার পিঠে উঠে পড়ো।' মিনু দেরি করলে না, লাফিয়ে মেঘের পিঠে চ'ড়ে বসলো। তারপর হু-হু ক'রে কোথায় উড়ে চললো কে জানে! আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এলো, ঝড় উঠলো, একটা রুদ্ধশ্বাস উন্মাদ গতি ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও যেন কিছু নেই। মেঘের ঝুঁটি আঁকড়ে ধ'রে মিনু মূর্ছিতের মতো প'ড়ে রইলো।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেলো সে জানে না। হঠাৎ চোখ মেলে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো—'এই তো সে কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। মেঘ তাহ'লে তাকে ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দিয়েছে! কিন্তু মেঘ কোথায়? স্কুলের বিজ্ঞানের বইয়ে মেঘবৃষ্টির বর্ণনা তার মনে পড়লো। মেঘ আর নেই, বৃষ্টি হ'য়ে গ'লে গেছে। ওঃ, যা এক পাগলা ঝোড়ো মেঘের পিঠে সে চড়েছিলো—এর পরে কেউ যেন আর তাকে স্পীডের কথা বলতে না-আসে! জামা-কাপড়-জুতোর কিছু আর নেই বোধহয়—একটুখানি কাদা বাঁচাতে গিয়ে খুব শাস্তিই হ'লো তার। কিন্তু না তো—তার সোনালি জুতো, জর্জেটের শাড়ি—সব একেবারে খটখটে চকচকে ফিটফাট রয়েছে। কী ক'রে হ'লো? আর, কলকাতাই বা এতো সুন্দর হ'লো কবে থেকে? পথ-ঘাট যেন রুপো দিয়ে মোড়া, পথের দু-পাশে নানা ছাঁদের আলোর ঝাড়গুলো যেন গিনিসোনার গয়না, আকাশের তারা যেন হিরের টুকরো। আর প্রত্যেকটি বাড়ির এমন চেহারা যেন এইমাত্র তৈরি করা শেষ হ'লো। এ কোথায় এলো সে! মেঘ কি ভুল ক'রে অন্য কোথাও রেখে গেলো তাকে!

তিনটি মেয়েকে তার দিকে আসতে দেখা গেলো। তাদের চেহারা তাদের বেশভূষা এতই সুন্দর যে মিনুর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। মেয়েদের সাজসজ্জা সে কম ছাখেনি, সুন্দরীও কিছু দেখেছে, কিন্তু এদের তুলনায় তারা কিছুই না। এদের গা ফুটে যেন আলো বেরুচ্ছে, শাড়িগুলো যেন চাঁদের আলো দিয়ে বোনা। মিনু একটু এগিয়ে ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলে, 'হ্যাঁ ভাই, এটা কি কলকাতা?'

মেয়েরা তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে মুচকি হাসলো।

'কী বললে ?'

'জিগেস করছি, এটা কি কলকাতা শহর ?'

'কল্—কাতা। ক—ল্‌কাতা। কী অদ্ভুত নাম।' মেয়ে তিনটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। 'এ নাম তুমি কোথায় পেলে ?'

'আমি—আমি সেখানেই থাকি কিনা।'

'ও, বুঝেছি। তুমি বিদেশী, পথ ভুল ক'রে চ'লে এসেছো। না ভাই, এটা কলকাতা-টলকাতা কিছু নয়—এ-দেশের নাম চিরনূতন।'

'চিঁড়েতন ?'

আবার হেসে উঠলো তিনজন :—'না গো, না, চিরনূতন। এ দেশে কিছুই পুরোনো হয় না। বুঝেছো এবার ?'

'এ দেশে কিছুই পুরোনো হয় না ?'

'না।'

'কোনোদিন না ?'

'কোনোদিন না।'

'তবে তো ভালো জায়গাতেই এসেছি !' মুহূর্তে মিন্নুর মন চাঙা হ'য়ে উঠলো। বাড়ির জন্যে মন-কেমন-করা একদম সেরে গেলো তার। 'শোনো, আমি তো এ-দেশের কাউকে চিনিনে, আমার একটু থাকবার জায়গা কি ক'রে দেবে তোমরা ?'

'তার জন্যে ভাবছো কেন—আমাদের বাড়ি চলো তুমি। আমরা তিনজন কাঞ্চনবীথিকার একটি ছোট্ট বাড়িতে থাকি—তোমার যদি অসুবিধে হয়, পরে নাহয় আমাদের প্রধানকে ব'লে ইন্দ্রভবনে তোমার জন্যে ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

ওদের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো মিন্নু। জিগেস করলে, 'কী নাম ভাই তোমাদের ?'

মাথায় যে মেয়েটি সবচেয়ে বড়ো সে বললে, 'আমার নাম মণিচূর্ণিকা, এর নাম কনককিঙ্কিণী, আর ওর নাম রজতরঙ্গিকা। তোমার কী নাম ?'

মিন্নু মনে মনে ভাবলে—কী অদ্ভুত নাম। যেন এক-একখানা গয়না! মুখে বললে, 'আমার নাম মিন্নু—ভালো নাম মানসী।'

তার নাম শুনে মেয়েরা একটু হাসলো।

২

মণিচূর্ণিকাদের বাড়ি দেখে মিন্নুর চোখে আর পলক পড়ে না। সুন্দর বললে কিছু বলা হয় না, বলতে হয় অপরূপ। ঘরের পর ঘর, বারান্দার পর বারান্দা; মেঘগুলো রঙিন কাঁচের মতো, জানলার কাঁচ রুপোর মতো, রুপোর বাসন চাঁদের আলোর পাতের মতো—আগাগোড়া এমন একটি নিখুঁত নিটোল পরিচ্ছন্নতা, যার কাছে সায়েবদের দোকানও হার মানে। মিন্নুর কেবলই মনে হ'তে লাগলো, কোথায় এলো সে।

'কেমন, এখানে তোমার সুবিধে হবে তো?' জিগেস করলে কনককিঙ্কিণী।

'সুবিধে মানে?' মিন্নু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। 'কী চমৎকার। এই নাকি তোমাদের ছোটো বাড়ি? বাড়িতে আর কাউকে দেখছি না?'

'আমরাই থাকি এখানে।'

'শুধু তোমরা?'

রজতরঞ্জিকা বললে, 'আর আবার কে থাকবে?'

'তোমাদের মা-বাবা—'

'মা-বাবা আবার কী?'

'মা-বাবা কাকে বলে জানো না তোমরা?'

'না তো! ওরকম কথা তো আমরা কখনো শুনি নি!'

মিন্নু মহা ভাবনায় পড়লো। যে-দেশে মা-বাবা ব'লে কোনো জিনিস নেই, সে আবার কেমন দেশ?

মণিচূর্ণিকা কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করলে, 'মা-বাবা কাকে বলে ভাই?'

মিন্নু সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'বাড়িটা তোমাদের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো না?'

'বড়ো? না তো। আমরা এক-একজন খানচারেক মাত্র ঘর নিয়ে থাকি। চতুরঙ্গ পথে যারা থাকে তারা তো আমাদের দেখে নাকই শিঁটকোয়। দশখানা ঘরের কমে একজনের কী ক'রে চলতে পারে তা তারা ভেবেই পায় না।'

'বলো কী! একজনের জন্যে দশখানা ঘর! আচ্ছা ভাই, এত সুন্দর পথঘাট তোমাদের দেশে, এত চমৎকার বড়ো বড়ো সব বাড়ি, কিন্তু সবই যেন ফাঁকা-ফাঁকা চুপচাপ—লোকজন এত কম কেন?'

'কম কোথায়? এর চেয়ে বেশি লোক হ'লে পাগল হ'য়ে যেতুম। তোমরা বুঝি খুব ভিড় আর গোলমালের মধ্যে থাকতে ভালোবাসো?'

'না না, তা নয়—তবে কী, পথঘাট বেশ লোকজনে ঝমঝম করলে ভালো লাগেনা কি?'

কনককিঙ্কিণী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'কী জানি, আমাদের পছন্দ অন্য রকম। আমরা তিনজন যে এ-বাড়িতে আছি এ-ই এক-এক সময় ঘেঁষাঘেঁষি ঠেকে। চল্লিশ বছর আগে প্রথম যখন এ-বাড়িতে এলাম—'

'কী বললে?'

'বলছিলুম যে, চল্লিশ বছর আগে প্রথম যখন—'

'বলছো কী! তোমাদের বয়স কতো?'

'আমার ষাট, রজতরঙ্গিকার পঁচাত্তর আর মণিচূর্ণিকার নব্বুয়ের কাছাকাছি।'

মিন্নুর হঠাৎ কেমন ভয় হ'লো। এরা সব বদ্ধ পাগল নয় তো!

'তুমি খুব অবাক হ'য়ে গেছো মনে হচ্ছে?'

মিন্নু নিজেকে সামলে বললে, 'তোমাদের দেখে তো মনে হয় যে তোমরা আমারই বয়সী।'

রজতরঙ্গিকা বললে, 'দেখে আবার বয়সের কী বুঝবে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চেহারার বদলে হ'লেই গিয়েছিলুম আর কি!'

তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠলো। মিনু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না-পেরে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

৩

চিরনূতন দেশের হালচাল সমঝে নিতে মিনুর বেশি দেরি হ'লো না। এখানে সবই নতুন, চিরকাল নতুন। বছরের পর বছর কেটে যায়, মানুষের মুখে কি চেহারায় তার কোনোই ছাপ পড়ে না। নগরের যিনি প্রধান তাঁর বয়স নাকি চার হাজার বছর, অথচ দেখতে ঠিক কুড়ি বছরের যুবকের মতো। পাঁচশো, সাতশো, হাজার, দু'হাজার বছরের লোক তো পথে-ঘাটে কতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেশে মণিকারাই ছেলেমানুষ, কিন্তু তাদের চেয়েও ছোটো যারা—যাদের বয়স তিরিশ, পঁচিশ, এমন কি মাত্র দশ বারো, তাদেরও ঠিক মণিচূণিকাদের মতোই দেখতে। চেহারা দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই—সব মেয়েই ষোলো বছরের মতো আর সব পুরুষই কুড়ি বছরের মতো দেখতে। আর সকলেই আশ্চর্য সুন্দর—কাকে ফেলে কাকে দেখবে সে-বিষয়ে মনস্থির করতে মিনুর এত সময় লাগে যে অনেককে ভালো ক'রে দেখাই হয় না।

ধুলো নেই, কাদা নেই, পোকা নেই, শ্যাওলা নেই, মরচে নেই—এমন কিছুই নেই যা জিনিশকে ময়লা করে, পুরোনো করে, সুন্দরকে খামখা কুৎসিত ক'রে তোলে। রাত্তিরে শিশির পড়ে না, জোরে হাওয়া দেয় না কখনো, বৃষ্টি নেই, কুয়াশা নেই, রোদ অতি স্নিগ্ধ। সব সময় অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ পরিষ্কার নীল, ঠিক যেন বসন্তকাল। বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, পোশাক, বাসন—প্রতিদিনের ব্যবহারে প্রত্যেকটি জিনিশে কী আশ্চর্য জৌলুস। চুলের কাঁটাগুলি পর্যন্ত আয়নার মতো ঝকমক করছে!

এই তো মিনুর মনের মতো দেশ! মিনুর এই সোনালি-চামড়ার জুতোজোড়াটিকে মনে হয় যেন সোনা দিয়েই তৈরি।

চিরনূতন দেশের অফুরন্ত আনন্দে মিনু ডুবে রইলো। এখানে কারুর কোনো কাজ নেই—স্কুল, কলেজ, আপিশ কিছু নেই—কেবল শুধু খায়, ঘুমোয় আর ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এদের সাজ-বদলের ঘটা, বিকালবেলায় মেয়ে-পুরুষের দল যখন নানা রঙের কাপড় প'রে প্রমোদ-উদ্যানে বেড়ায় আর সূর্যের আলো তাদের কাপড়ে, মেয়েদের গায়ের গয়নায় প'ড়ে চিকচিক করে, তখন মিনুর মনে হয় যে এত সুন্দর কোনো দৃশ্য সে সিনেমাতেও কখনো ছাখে নি। এ-দেশে যদি সে থাকতে পায় তবে আর-কিছু সে চায় না।

একদিন রজতরঙ্গিকা বললে, 'কাল খুব সকালে উঠেই প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ো, কাল আমাদের পণ্যোৎসব।'

'কোনো পুজো-টুজো বুঝি?' জিগেস করলে মিনু।

কনককিঙ্কিণী বললে, 'সামগ্রী-সংগ্রহ উৎসবও বলতে পারো। এরকম ব্যাপার তোমাদের দেশে নিশ্চয়ই ছাখোনি।'

পরের দিন খুব সকালেই ওরা বেরিয়ে পড়লো। মিনুর মনে হ'লো আজ যেন পথে লোক একটু বেশি। একটু পরেই সে বুঝলো যে, চিরনূতন দেশের সব লোকই আজ বেরিয়ে পড়েছে আর সকলে যাচ্ছে একই জায়গায়। প্রমোদ-উদ্যানে মস্ত মেলা ব'সে গেছে। জিনিশ। জিনিশ। জিনিশ। কত রঙের, কত রকমের কত জিনিশ তার অন্ত নেই। যার যেটা খুশি তুলে নিচ্ছে, কেউ কোনো দাম দিচ্ছে না। অথচ কেউই বেশি কিছু নিচ্ছে না; ছু'একখানা কাপড়-চোপড় কি একটুকরো গালিচা, কি ছু'একটা থালা গেলাস—এর বেশি কারো হাতেই নেই। মিনুর ইচ্ছে হচ্ছিলো সব জিনিশ তুলে নিয়ে আসতে, কিন্তু অন্যদের দেখাদেখি সে খান-ছুই শাড়িই শুধু নিলে, মনের ইচ্ছে মনেই র'য়ে গেলো।

ফেরবার পথে রজতরঙ্গিকা জিগেস করলে, 'কেমন লাগলো?'

'খুব ভালো। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'বছরের এই একটা দিনে আমরা সামগ্রী সংগ্রহ করি। মানে, আমাদের ঘরে আরো জিনিশ আসে।'

'তোমাদের বুঝি জিনিশের জন্যে দাম দিতে হয় না?'

'দাম? দাম কাকে বলে?'

'আমাদের দিতে হয়। তাছাড়া আমাদের দেশে প্রায় রোজই নতুন জিনিশ—মানে, আরো জিনিশ, কিনতে—মানে আনতে হয়।'

'রোজই নতুন জিনিশ আনা! কী সর্বনাশ! আমাদের এই বছরে একদিন, তাতেই ভাবনা হয় কোথায় রাখবো নিয়ে। অনেক বছর আমরা তো কিছু নিইও নে, খালি হাতেই ফিরে আসি।'

মিনুর এতক্ষণে মনে পড়লো যে এ-দেশে একটিও দোকান তার চোখে পড়েনি। তাই তো! দোকান কেনই বা থাকবে? কোনো জিনিশই যদি কখনো পুরোনো না হয়, তাহ'লে তো আর নতুন জিনিশের দরকার হবে না! কথাটা ভেবে মিনুর মনটা হঠাৎ একটু খারাপ হ'য়ে গেলো। একটা নতুন জিনিশ কিনতে যে কত আনন্দ, তা কি এরা জানে?

৪

চিরনূতন দেশে কতকাল যে মিনুর কেটে গেলো, তা কে বলবে! হয়তো তিন দিন, হয়তো তিন বছর। এ দেশে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত নেই, ছুটি নেই, রোগ নেই, দুঃখ নেই—এ দেশে মানুষ সময়ের হিশেব রাখে কেমন ক'রে! শুধু সাজগোজ ক'রে ঘুরে বেড়ানো, শুধু সুন্দর হ'য়ে ব'সে থাকা—এ তো খুবই ভালো, কিন্তু আর ভালো লাগছে না কেন? এত ভদ্র এরা, এত চমৎকার, কিন্তু এদের সঙ্গে গল্প যেন জমে না, দিনের পর দিন একসঙ্গে এক বাড়িতে থেকেও মণিচুর্ণিকাদের সঙ্গে তার ঠিক যেন বন্ধুতা হ'লো না। তার স্কুলের পুরোনো বন্ধুদের জন্য তার এক-এক সময় মন-কেমন করে—তক্ষুনি মনে পড়ে, এদেশে তো সবই নতুন, বন্ধুতাও পুরোনো হ'তে পারে না তো।

ভাইবোনদের কথা মনে পড়ে—কিন্তু এদেশে কারো ভাই-বোন নেই, মা-বাপ কাকে বলে তাও এরা জানে না।

একদিন কথায় কথায় সে জিগেস করলে, 'আচ্ছা, তোমাদের দেশে একটিও শিশু দেখি না কেন?'

'শিশু?' তিন বন্ধু পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে।

'মানে, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে—'

'ছোটো মানুষ? বামন? না ভাই, বামনদের আমরা এদেশে ঢুকতেই দিইনে।'

'না না, বামন নয়। আমি বলছি কী,—আচ্ছা, তোমরা তো একদিন ছোটো ছিলে—'

'ছোটো ছিলুম? না! আমরা বরাবরই এই রকম।'

'আহা—একদিন তোমরা ছোটো হ'য়ে জন্মেছিলে তো?'

'কী যে তুমি বলো, তার কোনো মানেই হয় না। আমরা বরাবরই এই-রকম—এই-রকমই বরাবর থাকবো।'

মিনু একটু ভেবে বললে, 'একদিন তো তোমরা ছিলে না—তারপর একদিন প্রথম হ'লে। সেই প্রথম দিনটিতে কেমন ছিলে তোমরা?'

'ঠিক এই রকমই।'

'মনে আছে তোমাদের?'

'মনে আছে বৈকি। আমাদের সর্বকর্মা দেবতা আমাদের সকলকে ঠিক এইরকম ক'রেই রচনা করেছেন। কী চমৎকার ব্যবস্থা ছাখো তো—আমরা ঠিক গোনা-গুনতি তৈরি হয়েছি, তাই আমাদের দেশে কিছুরই টানাটানি নেই। তোমাদের দেশের কথা তোমার মুখে যে-রকম শুনি—ভিড়, গোলমাল, হৈ-চৈ, কম জিনিশ নিয়ে বেশি মানুষের কাড়াকাড়ি—ওরকম আমাদের এখানে হবার উপায়ই নেই। যে-ক'জন মানুষ খুব আরামে, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, সর্বকর্মা ঠিক সে-ক'জনই গড়েছেন।'

'আর নতুন গড়ছেন না?'

'না। আর দরকার কিসের? এ-ক'জনকে গড়তেই তাঁর চার হাজার বছর লেগে গেছে। আমাদের প্রধানকে গড়েছেন সকলের আগে—তিনি এই শহর বানালেন। তারপর আস্তে আস্তে আমরা সবাই এলুম।'

'কিন্তু তোমরা যখন ম'রে যাবে তখন তো—'বলতে-বলতে মিন্নু থেমে গেলো। তার মনে পড়লো যে চিরনূতন দেশে কেউ মরে না।

এর পর থেকে মিন্নুর কিছুই আর ভালো লাগে না। এই মণিচূর্ণিকা, কনককিঙ্কিণী, রজতরঙ্গিকা—এইসব মানুষ যাদের সে প্রতিদিন দেখছে—এরাই থাকবে চিরকাল, চিরকাল এদের এই একই রকম চেহারা, কেউ বুড়ো হবে না, কেউ মরবে না, কোনো ঘরে নতুন শিশু জন্মাবে না—এইসব উজ্জ্বল সুন্দর আশ্চর্য জিনিশগুলি—এরাও কোনোদিন নষ্ট হবে না, ভাঙবে না, এদের নিয়েই কাটাতে হবে দুশো, চারশো, হাজার-হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর। এই একই ভাবে, এইসব মানুষ আর এইসব জিনিশ নিয়ে কাটাতে হবে চিরকাল। কোনো কাজ করতে হবে না, কারো সঙ্গে ভাব হবে না, কোনো মানুষকেই পুরোনো বন্ধু ব'লে ভালোবাসবে না—দোকান নেই, জিনিশ কেনা নেই, মা-বাবা ভাই-বোন নেই, স্কুল নেই, পড়াশুনো কাজকর্ম কিছু নেই—শুধু রংবেরঙের কাপড় প'রে অপরূপ সুন্দর হ'য়ে চিরকাল বেঁচে থাকা। না, না, অসম্ভব!

একদিন মণিচূর্ণিকা বললে, 'তোমার আর সেরকম আনন্দ নেই কেন?'

মিন্নু কথা না-ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার মনে পড়লো যে মণিচূর্ণিকার বয়স নব্বুই, আর কেমন একটা ভয়ে, ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। তার পঁচাত্তর বছরের ঠাকুমার কুঁকড়োনো কুঁচকোনো দাঁত-পড়া গাল-ভাঙা ফোকলা মুখ মনে পড়লো তার। কেমন ভালবাসা মাখানো সেই মুখ। ঠাকুমা যদি তারই মতো দেখতে হতেন—সে কি অকথ্য কুৎসিত হ'তো না?

কনককিঙ্কিনী বললে, 'তুমি ভাবছো কেন ভাই? এদেশে এসে তুমিও আমাদের মতো চিরনূতন হয়েছো, আমাদের মতোই চিরকাল তুমি আনন্দে কাটাবে, দুঃখ কাকে বলে জানবে না।'

মিনু দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'লে উঠলো, 'না, না, আমি ওসব চাইনে।'

রজতরঙ্গিকা বললে, 'এদেশে এসে আমাদেরই মতো অমর হয়েছো তুমি, এর পরে আর কী চাও?'

মিনু চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, 'না, না, আমি অমর হবো না।' তার সমস্ত শরীর ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠলো কিন্তু বাইরে একফোঁটা ঘাম বেরুলো না—চিরনূতন দেশে কেউ ঘামে না—তাতে তার ভিতরে ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে লাগলো। কান্না পেলো, কান্না এলো না। আয়নায় দেখলে, তার মুখ অপূর্ব সুন্দর। চোখে মুখে আলোর মতো হাসি খেলা করছে। মনের দুঃখে আয়নায় কপাল ঠুকতে লাগলো—কই, ব্যথা কোথায়, মনে হ'লো মখমলের বালিশ তাকে আস্তে ছুঁয়ে আদর করছে। আয়নাটা তুলে নিয়ে সে ছুড়ে ফেলে দিলে! কাচের মতো মেঝের উপর জলতরঙ্গের মতো শব্দ হ'লো, কিন্তু কোথাও একটু চিড় লাগলো না—না আয়নায়, না মেঝেতে। পরনের শাড়িটা কামড়াতে লাগলো—শাড়িটা একটু কুঁচকোলো না পর্যন্ত। তখন পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে করতে বলতে লাগলো, 'এখানে আর আমি থাকবো না, আর আমি থাকতে পারবো না—আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

মিনু ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। তার দু'দিকে চির-নূতন দেশের উজ্জ্বল আশ্চর্য বাড়িগুলি উল্কার বেগে উল্টো দিকে ছুটছে। পালাও—পালাও, এখানে আর এক মুহূর্ত না! তার পিছনে ছুটে আসছে এদেশের সব মেয়ে-পুরুষ, তাদের কারো মুখ ডাইনির মতো, কারো মুখ রাক্ষসের মতো, তাদের আঙুলগুলো যেন কিলবিলে লিকলিকে সাপের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে তাকে ধরবে ব'লে।

পালাও, পালাও! উঃ, এদেশের সীমা কোনোদিন সে কি পেরোতে পারবে না! মনে হচ্ছে বছরের পর বছর সে কেবলই ছুটছে, আর চিরনূতনের দল তাকে কেবলই তাড়া করছে—কোনোদিন সে কি থামতে পারবে না? ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ে গেলেও সে বাঁচে, ম'রে গেলেও সে রক্ষা পায়—কিন্তু এদেশে তো ক্লান্তি নেই, মৃত্যু নেই—হায় রে, মৃত্যু পর্যন্ত নেই!

হঠাৎ সে যেন শুনতে পেলো হরিপদর গলার ডাক, 'দিদিমনি!'

সে কি স্বপ্ন দেখছে? না, না, ঐ তো স্পষ্ট শোনা গেলো, 'দিদিমনি!' কে জানতো হরিপদর গলার আওয়াজ এতো মিষ্টি!

হরিপদ বললে 'এই যে দিদিমনি, একটা কাঠ ফেলে দিয়েছি, এর উপর দিয়ে চ'লে আসুন।'

মিনু চমকে চোখ তুলে হরিপদর দিকে তাকালো। এতক্ষণ সে কি এক পা তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো? কী ভাবছিলো? তবে যে মনে হ'লো এতক্ষণ সে—উঃ, কী সব ছাইভস্ম ভাবনা মানুষের মনে আসে!

নিশ্বাস ছেড়ে মিনু চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। এই তাদের বাড়ি, তাদের রাস্তার ফোকলে ফোকলে বৃষ্টির জল জ'মে আছে, ছোটো ছেলে-মেয়ের দল চ্যাঁচামেচি করতে করতে পার্কে যাচ্ছে। এ কিছুই না, এ সে রোজই ছাখে, কিন্তু এখন তার এতো ভালো লাগলো যে চোখে জল এসে পড়লো।

হরিপদ আবার বললে, 'এই কাঠের উপর দিয়ে চ'লে আসুন।'

কিন্তু সে অবাক হ'য়ে গেলো যখন দেখলো যে দিদিমনি তাঁর জুতোসুদ্ধ পা কাদার উপরেই রাখলেন। এদিকে মিনু যখন তাকিয়ে দেখলো যে তার ঝকঝকে সোনালি জুতো কাদায় কালো হ'য়ে যাচ্ছে, তখন তার মনে যে কী আনন্দ হ'লো, তা কি সে কোনোদিন কাউকে বলতে পারবে?

সর্বনেশে মাদুলি

লীলা মজুমদার

পুজোর ছুটির পর যখন স্কুল খুললো, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলাম গুপে ডান হাতে মাদুলি বেঁধে এসেছে। কনুইয়ের একটু উপরে ময়লা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা চকচকে এক মাদুলি। আমি ভাবলাম সোনার বুঝি, কিন্তু গুপে পরে বললো নাকি পেতলের। ঘাম লেগে লেগে সোনার মতো হ'য়ে গেছে।

টিফিনের সময় জিগগেস করলাম, 'কেন রে?' তাতে সে এক আশ্চর্য কথা বললো।

তার দাদামশায়ের নাকি যখন অল্প বয়েস, একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের তলায় চকচকে এক কুচকুচে কাগের পালক। প্রথমটা খুব খুশি হলেন। ভাবলেন দিব্যি এক খাগের কলম বানিয়ে বন্ধুদের লম্বা লম্বা চিঠি লেখা যাবে। পরে শিউরে উঠলেন। কী সর্বনাশ! কাগ যে ছুঁতে নেই, ইয়ে-টিয়ে খায়, আর পালক বালিশের তলায় এলো কোত্থেকে? আর কেউ দেখবার আগেই সেটাকে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে উঠোনে ফেলে দিলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের নিচে আবার আর-একটা কাগের পালক! এবার আর কোনও সন্দেহই নেই, দস্তুরমতো কাগ-কাগ গন্ধ পর্যন্ত পেলেন। দাদামশাই সেইদিনই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন, চুল ন্যাড়া করলেন, পাশের বাড়ির লোকদের তাদের গাছ-ছাঁটা কাঁচিটা ছ'মাস বাদে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন, গঙ্গাস্নান করলেন।

স্নান ক'রে উঠে ঘাটের উপর দেখেন, দিব্যি ফোঁটা কাটা, তিলক আঁকা, জটাওয়ালা, গেরুয়া-পরা এক সন্ন্যাসীবাবা হাসি-হাসি মুখ ক'রে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। দাদামশাই তাঁকে ঢিপ ক'রে প্রণাম করিলেন। অমনি সন্ন্যাসী তাঁর ডান হাতের কনুইয়ের উপর ঐ লাল সুতো দিয়ে মাদুলিটা বেঁধে দিয়ে, দাদামশায়ের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কুচ ডর নেই বেটা। সাঁপখোঁপ সব কেটিয়ে যাবেন।'

দাদামশায়ের ঘাড়ে খুব সুড়সুড়ি লাগা সত্ত্বেও তিনি শুধু একটু কিলবিল ক'রে বললেন, 'ঠিক বলছো তো ঠাকুর?'

গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে সন্ন্যাসীঠাকুর ঝুলির মধ্যে থেকে সুতো-বাঁধা এক চশমা বের ক'রে নাকে প'রেই আঁৎকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ! এ কী আছে রে? আরে আমি তো তোমাকে চিনতে পারে নি, উ মাদুলি পল্টু জমাদার কো আস্তে বনায়া, দে দেও রে বেটা উ তোমরা নেহি!'

কিন্তু কে শোনে? দৈবাৎ অমন মাদুলি মানুষের জীবনে এক-আধবার ঘ'টে যায়। তাকে কি অমনি-অমনি দিয়ে দেওয়া যায়? দাদামশাই ছপাৎ ক'রে মালকোঁচা মেরে দে-দৌড়!

বাড়ি এসে অবাক হ'য়ে দেখলেন, পাশের বাড়ির আমগাছের যে ডাল পাকা পাকা আমসুদ্ধ তাঁদের উঠোনের উপর ঝুলছিল অথচ পাছে নেপালবাবু পুতে ফেলেন সেই ভয়ে কিছু করা যাচ্ছিল না, সে-সব আম আপনি আপনি দাদামশায়ের উঠোনে প'ড়ে গেছে। দেখা গেলো নতুন কুয়োতেও ভোর থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আসছে। রাত্রে ফেলাদা পুকুরে যে ছিপ ফেলে রেখেছিল তাকে মস্ত এক কাতলা মাছ পড়েছে। বেলা না-হ'তেই দাদামশায়ের শালা গত বছর যে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিল, নিজে থেকে ফেরত দিয়ে গেলো। উপরন্তু রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন ক'রে গেলো। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখলেন, দিদিমার পর্যন্ত হাসিমুখ।

মাদুলির গুণ দেখে দাদামশাই অবাক। মনে মনে সন্ন্যাসীবাবার ময়লা পায়ে শত-শত প্রণাম করলেন।

সেই থেকে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গেলো। টাকা-পয়সা হ'লো, গোরু-ভেড়া হ'লো, ছেলেরা বড়ো-বড়ো চাকরি পেলো, মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ে হ'লো। এমনকি মামার বাড়ির গোরুর দুধের ক্ষীর, গাছের আম, পুকুরের মাছের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনার চোটে গুপে 'লোমহর্ষণ সিরিজ'এর বিশ নম্বর বইয়ের পাঁচ-ছটা পাতার কোণা কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললো।

আরও বললে, 'এই সেই মাদুলি। একচল্লিশ বছর এক মাস দাদামশায়ের হাতে বাঁধা ছিলো, একদিনের জন্যও খোলা হয়নি। দাদামশায়ের হাতে সুতো-বাঁধা মাদুলির শাদা দাগ প'ড়ে গেছে। গায়ে লেগে লেগে শেষটা এমন হয়েছিল, যে মাঝে মাঝে নাকি মাদুলিটার উপরেও চুলকোতো।'

সেই মাদুলি দাদামশাই এক কথায় গুপের হাতে বেঁধে দিয়েছেন, কারণ গুপে বায়না ধরেছিল যে মাদুলি না দিলে নাকি সে তেলও মাখবে না, চানও করবে না, ভাতও খাবে না। আর নেহাৎ যদি খায়ও তাহ'লে এতো কম খাবে যে কিছুদিন বাদে পেট না ভরে-ভরে হাত-পা ঝিমঝিম করবে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে, চোখ উল্টে যাবে— এই অবধি শুনেই দাদামশাই কানে হাত দিলেন ও তখুনি পট্‌ ক'রে মাদুলির সুতো ছিঁড়ে গুপের হাতে বেঁধে দিলেন।

গুপে দেখলে, মাদুলির গুণ একটুও কমেনি। আধঘণ্টার ভিতরে ছোটোমামার ফাউন্টেন পেনের নিব খারাপ হ'য়ে গেলো, ছোটোমামা সেটা গুপেকে দিয়ে দিলে। পরে অবিশ্যি আবার চেয়েছিল, তাইতেই তো গুপে ছুটির দু'দিন বাকি থাকতেই মামার বাড়ি থেকে চ'লে এসেছিল।

বাড়ি এসেই শোনে মাস্টারমশাইয়ের মাম্পস্‌ হয়েছে, গাল ফুলে চালকুমড়ো; সেরে যদি বা ওঠেনও তবু একটি মাসের ধাক্কা।

এরপর গুপে যা-তা বলতে আরম্ভ করলো। নাকি মাদুলি হাতে পরা থাকলে গুপে যখন যা বলবে তাই ঘটতে বাধ্য।

এ কথা শুনে আমরা সবাই ভীষণ আপত্তি করলাম, 'তা কি কখনো হয় ?'

নগা বললে, 'এক যীশু ছাড়া আর কেউ—'

গুপে ভীষণ রোগে সরু লম্বা ময়লা নখওয়ালা একটা আঙুল নগার দিকে বাগিয়ে বললো, 'আজ বলে দিলাম তুই ভূগোল ক্লাসে দাঁড় খাবি।'

ওমা! সত্যিসত্যি ভূগোল ক্লাসে নগা দাঁড় তো খেলোই, তার উপর কানমলাও খেলো! এর পর আর কারু কিছু বলবার জো নেই। গুপে একবার মাদুলির দিকে তাকালেই হ'লো, সে যখন যা বলে সবাই তা মেনে নেয়। যখন যা চায় সবাই তাই দিয়ে ফেলে।

তিন সপ্তাহ ক্লাসসুদ্ধ সবাই গুপের দৌরাত্ম্যে খাবি খেলাম। সে যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করলো। এমনকি কালীপদর চুল-ছাঁটা পছন্দ হচ্ছিল না ব'লে সে বেচারাকে ন্যাড়া করিয়ে ছাড়লো। সবাই দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলাম। নগার তো পেন্টলুন এমন ঢিলে হ'য়ে গেলো যে শেষে তার দাদা তাই নিয়ে টানাটানি। বলে কি না, 'দেখছিস না, ও আমার, তোর গায়ে বড়ো হচ্ছে! হয় আমার, নয় বাবার।'

এদিকে যার যা ভালো জিনিস গুপে সব গাপ করতে লাগলো। পেনসিল, রবার, পেনসিল-কাটা, রঙিন খড়ির বোঝায় গুপের পকেট ঝুলে ছেঁড়ে আর-কি! শেষে কিনা সেসব রাখবার জন্যে আমার নতুন টিফিনের বাক্সটা একদিন চেয়ে বসলো! তখন আমি বেজায় চ'টে গেলাম। একটু তোতলামি এসে গেল। মাথা-টাথা নেড়ে বললাম, 'ছ্যা-ছ্যাখ্ গুপে, দিন দিন তোর বাড় বাড়ছে! কাল তোর সব অঙ্ক কষে দিয়েছি। আমার টিফিনের অর্ধেকের বেশি খেয়ে

ফেলেছিস। ইংরিজি ক্লাসে ছুরি ফটফট করেছিস আর তার জন্যে বকুনি খেয়েছি আমি। বেশি বাড়াবাড়ি করিস নে ব'লে দিলাম।'

এক নিশ্বাসে রাগের মাথায় এতগুলো কথা ব'লে দেখি, গুপে আমাকে শাপ দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার চোখদুটো ছোটো হ'য়ে আলপিনের ডগার মতো হয়ে গেলো, ঢোক গিলে, গলা হাঁকড়ে, আঙুল বাগিয়ে, খনখনে গলায় বললো, 'আজ তোর জীবনের শেষ দিন। দিনটা কাটলেও রাত কাটবে না।' ক্লাসময় একটা থম-থমে চুপচাপ। তার মধ্যে নরেনবাবু এসে গেল, আর কিছু হ'লো না।

একটু পরেই আমার গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসতে লাগলো, নিশ্বাসটা কিরকম জোরে জোরে পড়তে লাগলো, চুলের গোড়াগুলো শিরশির করতে লাগলো, পেটের ভিতরে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হ'তে লাগলো।

বুঝলাম মাদুলির শাপ আমার লেগেছে। কিছু পড়া-টড়া শুনলাম না, হোমটাস্ক টুকলাম না, ড্রয়িং ক্লাসে বেয়াদবি করলাম। যার দিন কাটলেও রাত কাটবে না, তার আবার ভাবনা কী? টিফিন-বাক্সটা ক্লাসের মধ্যেই নগার হাতে ঠুসে দিলাম—আমি মরি আর গুপে সেটা ভোগ করুক আর-কি!

ছুটির ঘণ্টা পড়লে পর মনে হ'লো, আমি তো গেলাম, যাবার আগে ঐ সর্বনেশে মাদুলিটাকে শেষ ক'রে যাবো!

দেখি গুপেদের পুরোনো চাকর ভদ্দু গুপের বই গুছিয়ে নিচ্ছে, আর গুপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। হঠাৎ খুন চ'ড়ে গেলো, ছুটে গিয়ে এক সেকেণ্ডে মাদুলিটাকে কেড়ে মাড়িয়ে ভেঙে একাকার! তার থেকে অন্তত ধোঁয়াও বেরুনো উচিত ছিল, কিন্তু কিছু হ'লো না। গুপে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু ওদের চাকরটা হাঁই-হাঁই ক'রে ছুটে এসে হাত-পা ছুঁড়ে বললে—

'অ্যাঁ। কী করলে! আমার পেটব্যথার অব্যর্থ মাদুলি, আমি কালীঘাট থেকে দু'পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি! আগেই জানি গুপী-দাদাকে যা দেওয়া যাবে তাই আর কিছু থাকবে না!'

আমরা সবাই হাঁ ক'রে গুপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নিশ্চয় কিছু বলা উচিত ছিলো, কিন্তু সে অম্লান বদনে পকেট থেকে দুটো পয়সা বের ক'রে ভন্দুকে ছুঁড়ে দিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বাড়ি চ'লে গেলো।

প্রফেসর ভড়ের উপাখ্যান

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দোলাইগঞ্জ গ্রামে তোমরা গিয়াছ কি না জানি না। জলাঙ্গীর ধারে ছোটো গ্রামটি, বেশ সমৃদ্ধিশালী। গ্রামে ঢুকিতেই ঘন নারিকেল গাছের আড়ালে যে উঁচু মিনারের মতো জিনিশটি চোখে পড়ে—সেটিকে কিন্তু তোমরা মনুমেণ্ট-টনুমেণ্ট কিছু মনে করিয়া বসিও না। দোলাই-গঞ্জ পলাশীর মতো কোন বিখ্যাত জায়গা নয়, অন্ধকূপ-হত্যার মতোও এমন কোনো প্রসিদ্ধ ঘটনা সেখানে ঘটে নাই, যার জন্য একটা মনুমেণ্ট বসানো হইবে। তবে ?

গ্রামের ভিতর আর একটু ঢুকিলেই বুঝিবে, যেটিকে মনুমেণ্ট বলিয়া ভুল হইতেছিল সেটি একটি বিরাট ইঁটের চিমনি। তবে কি এখানে কোনও বড় কারখানা আছে ? না, তাও নয়। চিমনিটা স্থানীয় জমিদার-বাড়ির একটা অংশ।

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে, না ? আচ্ছা এক কাজ করো; ঐ চিমনির পাশের দরজাটা দিয়া আরও ভিতরে চলিয়া এস। অবশ্য সকলকেই যে এখানে ঢুকিতে দেওয়া হয় তা নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কোনও গোল বাধিবে না। কী দেখিতেছ ? প্রকাণ্ড বয়লার, অদ্ভুত অদ্ভুত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, নানা রকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম—এই অজ পাড়াগাঁয়ে এ-সব কী কাণ্ড! আর-একটু অগ্রসর হও—এই—এই ঘরে, দেখ, দেওয়াল-ভর্তি কত বড়ো বড়ো সব চার্ট নক্সা ঝুলিতেছে, তার গায়ে কত হিজি-বিজি লেখা—তোমরা তার মানেও বুঝতে পারিবে না। সামনে টেবিলের উপর

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই, আর তার চেয়েও বড়ো বড়ো খাতা—হিসাবের খাতা নয়, তার মধ্যে সব দুরূহ জটিল বিষয়ের নোট লেখা আছে।

এতক্ষণে বোধহয় বুঝিতে পারিতেছ এটি একটি ল্যাবরেটরি। ঘরের এক কোণে বিরলকেশ, কিঞ্চিৎ নধর চেহারার যে ভদ্রলোকটি বসিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে পুঁথি ঘাঁটিতেছেন তিনিই এই ল্যাবরেটরির মালিক—প্রফেসর ভড়। প্রফেসর শুনিয়া তোমরা যেন মনে করিও না ইনি আমাদের রামধনু-সম্পাদকের মতো কোনও কলেজে প্রফেসরি করেন, কিংবা প্রফেসর রামমূর্তির মতো শরীর-চর্চায় কালাতিপাত করেন। তা নয়, ইনি একজন অ্যামেচার বৈজ্ঞানিক—নানারকম জটিল বিষয় লইয়া ইনি সারাক্ষণ গবেষণা করেন, তাই বন্ধুবান্ধবেরা এঁর নামের আগে একটা সম্মানসূচক প্রফেসর শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা প্রফেসর ভড়কে তাদের জমিদার শ্রীযুক্ত ভজগোবিন্দ ভড় বলিয়াই জানে, যদিও জমিদার মহাশয়ের বিদ্যানুরাগের কাহিনী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারও অবিদিত নাই। প্রফেসর ভড় অগাধ টাকার মালিক, কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ বড় লোকের মতো স্ফূর্তি করিয়া দিন কাটান না। জীবনে একটা কাজের মতো কাজ করিয়া যাইবেন এই তাঁর দৃঢ় পণ, নহিলে এই পাড়াগাঁয়ে এত বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এমন একটা ল্যাবরেটরি বসাইবার কথা কখনও শুনিয়াছ? কিছুদিন হইল প্রফেসর ভড় কি একটা নূতন বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। বিষয়টা কী কেহ জানে না, কিন্তু খুবই যে অদ্ভুত এবং জটিল একটা কিছু, সে বিষয় কারও সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হয়। প্রফেসর ভড়কে আজ কয়েকদিন যাবৎ যেন কেমন একটু বিচলিত দেখা যাইতেছে। গত সপ্তাহে বিলাত হইতে কয়েকখানা মিশরীয় পুঁথির নকল আসিবার পর হইতেই যেন এ ভাবটা একটু বাড়িয়াছে। এখনও তিনি সেই পুঁথির মধ্যেই নিমগ্ন আছেন। তাঁর

অনতিদূরে একটা বীকারের (কাঁচের পাত্র) মধ্যে রং-বেরংএর কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে।

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়িল। প্রফেসর ভড় ইতিমধ্যে পাত্রটির কাছে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। ঘরে ঢুকিল তাঁর চাকর। সে জড়সড় ভাবে প্রফেসরের সম্মুখে একটা কাপ রাখিয়া চলিয়া গেল। কাপটি খুব ছোটো—অর্থাৎ চায়ের কাপের চেয়ে ছোটো—অর্থাৎ সেটি চায়ের কাপ নয়, তার ভিতরকার তরল পদার্থের নাম কফি। প্রফেসর ভড় এ সময়ে চা খান না, কারণ আজকাল তাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়া কাজ করিতে হয়, কফি না খাইলে ঘুমাইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। প্রত্যহ এই সময়টা তাঁর মন 'কফি কফি' করিতে থাকে, কিন্তু আজ যেন তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি পেয়ালায় একটা চুমুক দিলেন, মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল ঠোঁটটা বুঝি একটু পুড়িয়া গেল। প্রফেসর ভড় বৈজ্ঞানিক হইলেও জমিদারের ছেলে এবং নিজে জমিদার—স্বভাবতই একটু আরামবিলাসী। এরূপ ব্যাপারে তাঁর বেশ একটু বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আজ যেন তাঁর কোনো দিকেই খেয়াল নাই। ঠোঁটটি আলগোছে জিভ দিয়া চাটিয়া তিনি আবার নিজের কাজে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

রাত প্রায় বারোটা বাজে। প্রফেসর ভড়ের আজ হইল কী? এতক্ষণের মধ্যে তিনি একবারও ল্যাবরেটরি হইতে বাহির হন নাই। মুখের ভাবও তাঁর যেন কেমন অস্বাভাবিক। একবার করিয়া টেবিলের পাত্রটি পরীক্ষা করেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া পুঁথি ওল্টান আর হিজিবিজি কি লেখেন। আবার ছুটিয়া পাত্রটির কাছে যান। বাতের ব্যারাম বলিয়া তাঁর সকাল-সকাল খাইবার কথা, কিন্তু আজ ইতিমধ্যে চাকর তিনবার ডাকিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। চতুর্থবার ভড়-জায়া অর্থাৎ প্রফেসর ভড়ের স্ত্রী নিজে আসিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই।

রাত দেড়টার সময় দেখা গেল প্রফেসর ভড় ঘরের মধ্যে ভীষণভাবে পায়চারি করিতেছেন আর বিড়-বিড় করিয়া কি আওড়াইতেছেন। মুখের ভাব তাঁর অদ্ভুত, কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা উৎফুল্ল ভাবও যেন মিশিয়া আছে। ভড়-জায়া সাহস করিয়া আবার আসিলেন, কিন্তু প্রফেসর এমন জোরে বিরক্ত ভাবে আঃ করিয়া উঠিলেন যে তিনি তাঁর বিরাট শরীর লইয়াও উল্টাইয়া পড়িবার জোগাড়। সে রাত্রে প্রফেসর ভড় আর ল্যাবরেটরি হইতে বাহির হইলেন না।

খুব ভোরবেলা ভড়-জায়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি একেবারে ল্যাবরেটরির দরজায় গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু কই, প্রফেসর ভড় তো ল্যাবরেটরির মধ্যে নাই। বাগানে গেলেন, সেখানেও নাই। কোথায় গেলেন তিনি? প্রফেসর ভড়ের ঘুম ভাঙিতে সাধারণত বেশ একটু বেলা হয়, তা ছাড়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া গড়গড়া না টানিয়া তিনি উঠিতে পারেন না—এমনি তাঁর বদ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সেই প্রফেসর ভড় এত ভোরে কোথায় গেলেন? হঠাৎ ভড়-জায়ার নজরে পড়িল—ছাদের উপর অস্পষ্ট আলোয় কি একটা জিনিশ নড়িতেছে। তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তা চোখে দেখিলেও বিশ্বাস হইতে চায় না। দেখিলেন প্রৌঢ় প্রফেসর খালি-গায়ে মালকোঁচা মারিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়াছেন, আর দুই হাতে তাঁর বড়ো ছেলে সতুর এক্সারসাইজের দুটি মুগুর লইয়া পালোয়ান গামার মতো ঘুরাইতেছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরনার মতো ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। হতভম্ব ভড়-জায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, প্রফেসর ভড় সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; মুগুর দুটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গোটা-কয়েক বৈঠক আর গোটা-কয়েক ডন দিয়া লাফাইতে লাফাইতে নিচে নামিয়া গেলেন। ভড়-জায়ার মাথা ঘুরিতেছিল, তিনি সেইখানেই ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

খানিক পরে ভড়-জায়া নিচে নামিয়া আসিলেন কিন্তু প্রফেসর

ভড়ের দেখা নাই। তাঁর ছোটো ছেলে নন্তু সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, ভড়-জায়া তাকেই প্রশ্ন করিলেন, 'তোর বাবা কোথায় রে ?'

নন্তু জবাব দিল, 'এই তো এতক্ষণ দিদির ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাউডার আর এসেন্ মাখছিলেন, এইমাত্র বড়দার জামা-জুতো প'রে বেরিয়ে গেলেন। আচ্ছা মা, বাবা তো পাউডার কোনোদিন মাখেন না, আর বড়দা'র জামা-জুতোই বা প'রতে গেলেন কেন ? তাঁর নিজের তো কতো আছে ?' ভড়-গৃহিনী মুখখানা হাঁড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা দশটা পর্যন্ত প্রফেসর ভড়ের কোনও খোঁজ নাই। প্রত্যহ তিনি ইহার অনেক আগেই গিয়া ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন, কিন্তু আজ এ কী হইল! বাড়ির সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রফেসর ভড়ের বড় ছেলে সত্যগোবিন্দ অর্থাৎ সতু বাপের খোঁজে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কয়েক পা যাইতেই তার বন্ধু মুকুন্দর সঙ্গে দেখা। 'তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম হে,' মুকুন্দ বলিল। 'তোমার বাবার কী হয়েছে বলো দেখি ? সকাল বেলা উঠে আমার কাছে গিয়ে হাজির। আমি তো ভাবলাম এই খেয়েছে, আমাদের সেই ড্রামাটিক ক্লাবের কথা হয়ত কোনো রকমে জেনে ফেলেছেন, অদৃষ্টে না জানি কী আছে! কিন্তু ওমা! উনি গিয়ে দিব্যি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "এই মুকুন্দ, আজ বিকেলে কলকাতা যাবি ? খুব ভালো একটা বায়োস্কোপ আছে। যাস তো চারটের সময় স্টেশনে আমার সঙ্গে মীট করিস।" শুধু এই নয়, তারপর এবার পুজোর সময় কী থিয়েটার করা যাবে তাই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন—গন্ধর্ব-বিজয় প্লে করলে তিনি নাকি রানীর পার্ট নিতে রাজি আছেন—বললেন, গানও তিনি গাইবেন। এই না ব'লে আমার হার্মোনিয়মটা টেনে নিয়ে বাজাতে শুরু ক'রে দিলেন। কী ব্যাপার বলো তো ? তোমার বাবা তো ভয়ানক গম্ভীর মেজাজের লোক, আমি তো ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেছি!' লজ্জা, ক্ষোভ ভয় একত্র মিলিয়া সতুর মুখখানা একটুকু করিয়া দিল।

বেলা তখন তিনটা হইবে। ভড়-জায়া আত্মীয়-বন্ধু যেখানে যে আছে সকলের কাছে একটা করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আবার স্বামীর খোঁজে আসিলেন। নন্তকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর বাবাকে এখন দেখেছিস?' নন্ত জবাব দিল 'হুঁ, ঐ তো পেয়ারা-তলায় লাট্টু ঘোরাচ্ছেন।' সত্যই। প্রফেসর কোমরে কষিয়া কাপড় বাঁধিয়াছেন, আর মাটিতে গোল দাগ কাটিয়া পরমানন্দে তার মধ্যে লাট্টু ঘুরাইতেছেন। ভড়-গৃহিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। খানিক পরে তিনি আবার সভয়ে দেখিলেন, প্রফেসর ভড় চুপি-চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া রান্নাঘর হইতে এক-খাবলা নুন চুরি করিয়া পলাইয়া আসিতেছেন। তারপর উঠানের একটা ছোটো আম-গাছে উঠিয়া কাঁচা আম পাড়িয়া ডালে বসিয়া বসিয়াই সেই লবণ সহযোগে তার সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরই প্রফেসর ভড় না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, শত সাধ্য-সাধনা করিয়াও তাঁহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া কিছু খাওয়ানো গেলো না।

পরদিন সকালে দেখা গেল প্রফেসর ভড় হামাগুড়ি দিয়া সারা বাড়ি চষিয়া বেড়াইতেছেন, আর মাঝে মাঝে কচি শিশুর মতো আধো-আধো স্বরে 'ত্মা ত্মা ত্মা ত্মা' করিতেছেন। তাঁর থাবার মতো বড়ো-বড়ো হাতের তেলো মাটিতে পড়িয়া থপ্-থপ্ আওয়াজ হইতেছে।

ভড়-জায়া একটা ইজি-চেয়ারে অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিলেন; অনিদ্রায়, অনাহারে, দুশ্চিন্তায় তাঁর সর্বশরীর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ বিষম খাওয়ার শব্দে তিনি ফিরিয়া দেখেন, প্রফেসর ভড় সামনে বসিয়া ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছেন—যেন গলায় কিছু একটা আটকাইয়াছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মুখে হাত দিতেই একটা বড়ো কোটের বোতাম বাহির হইয়া আসিল। প্রফেসর ভড় খেলা করিতে করিতে সেটা মুখে পুরিয়া দিয়াছিলেন। বিরক্ত হইয়া ভড়-জায়া আবার চেয়ারে আসিয়া

বসিলেন। খানিক পরে একটা খিল-খিল হাসি শুনিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, প্রফেসর টেবিলের উপর গিয়া বসিয়াছেন। তাঁর নাকে, চোখে, মুখে কালি মাখা। দু'হাত দিয়া তিনি একটা ভাঙা কালির দোয়াত লইয়া মাটিতে ঠুকিতেছেন আর মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতেছেন। নাঃ, ব্যাপার ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

সেইদিনই আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তারের দলে বাড়ি ভর্তি হইয়া গেল। মীটিং বসিল, ঔষধপত্র ইনজেকশন সব তৈরি হইল, কিন্তু ব্যারাম ধরা পড়িল না। এমন অদ্ভুত রোগের কথা তাঁরা কখনও শোনেন নাই, এমন ধরনের পাগলও তাঁরা কখনও দেখেন নাই।

সেইদিন নিরানন্দের মধ্যেও দুপুর বেলা হঠাৎ বাড়ির ছেলে-মহলে একটা অস্পষ্ট হর্ষধ্বনি শোনা গেল—'ধীরেন কাকা এসেছেন রে, ধীরেন কাকা!' ধীরেন কাকা অর্থাৎ ধীরেনবাবু প্রফেসর ভড়ের একজন বাল্যবন্ধু,—এখন পশ্চিমে কোন্ একটা কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। তিনি অবশ্য টেলিগ্রাম পান নাই—কি-একটা কাজে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন, একবার প্রফেসর ভড়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে আসিয়াছেন। পালোয়ান বলিয়া ইঁহার একটু-আধটু বদনাম আছে।

বলা বাহুল্য ধীরেনবাবু ছেলে-মহলে যতটা অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন বড়োদের মধ্যে তা পাইলেন না। হাঁ করিয়া তাঁকে সমস্ত ইতিহাস শুনিতে হইল। শুনিয়া ধীরেনবাবু আর স্নানও করিলেন না খাইলেনও না, আস্তে আস্তে প্রফেসর ভড়ের ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়া ভিতর হইতে খিল লাগাইয়া দিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, ধীরেনবাবু আর বাহির হইবার নাম করেন না। এদিকে প্রফেসর ভড় তাঁর আড়াই বছরের মেয়ে খুকুর সঙ্গে তার পুতুলের বাক্স লইয়া প্রায় মারামারি শুরু করিয়া দিয়াছেন বলিলেই চলে। খুকুও কান্না জুড়িয়া

দিয়াছে, তিনিও তেমনি ঠোঁট ফুলাইতেছেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর একবার ধীরেনবাবুর খোঁজ নিতে গিয়া সতু আসিয়া খবর দিল—ধীরেনবাবু ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন, আর মাঝে-মাঝে একবার করিয়া আসিয়া বই উল্টাইতেছেন;—টেবিলের উপর সেদিনকার সেই রাসায়নিক মশলার পাত্র এখনও কানায় কানায় ভর্তি, তিনি মাঝে-মাঝে সেটাও পরীক্ষা করিতেছেন। হায় রে, তাঁরও বন্ধুর দশা হইল না তো?

সন্ধ্যার একটু আগে ধীরেনবাবু ল্যাবরেটরি হইতে বাহির হইয়া ডাকিলেন, 'ভজ!' ভজ অর্থাৎ প্রফেসর ভজগোবিন্দ ভড়—তখনই হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া ধীরেনবাবুর হাঁটু ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর পরম আনন্দে ধীরেনবাবুর নাসিকা ভক্ষণে উদ্যত হইলেন। ধীরেনবাবু প্রফেসর ভড়ের টাকের ভিতরকার স্বল্পাবশিষ্ট চুল ক'গাছি ধরিয়া প্রচণ্ড জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়া তাঁর মাথাটা সরাইয়া দিলেন। প্রফেসর ভড়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, 'উঃ!' ধীরেনবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না, প্রফেসর ভড়ের নাকে, মুখে, চোখে অনর্গল কিল, চড় বর্ষণ করিতে শুরু করিলেন। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। ধীরেনবাবু বলিলেন, 'আপনারা বাধা দেবেন না, রোগ আমি ধরেছি। আপনারা দয়া ক'রে একটা নাপিত ডেকে দিন আর এই জিনিশ ক'টা এনে দিন।' জিনিশ আসিল, নাপিত আসিল। প্রফেসর ভড়ের টাকের মাঝখানে যে দু'চার গাছা চুল ছিল তাও কামাইয়া দেওয়া হইল। ধীরেনবাবু চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কয়েক কলসি ঘোল এনে আস্তে আস্তে ঢালতে থাকো।' তারপর তিনি এক শিশি কড়া নস্য আনিয়া প্রফেসর ভড়ের নাকের নিচে ধরিলেন এবং সেই-সঙ্গে তাঁর পিঠে আবার মুহুর্মুহু কিল-চড় বসাইতে লাগিলেন। হাঁচিতে হাঁচিতে, চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রফেসর ভড় শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু তবু নিস্তার নাই।

রাত্রি তখন প্রায় সাতটা। বসিবার ঘরে সকলে গোল হইয়া বসিয়া ছিল, ভড়-জায়া নিজ হাতে সকলকে কফি তৈরি করিয়া দিতেছেন। প্রফেসর ভড় একধারে ইজি-চেয়ারে চিৎপাত হইয়া শুইয়া গড়গড়া টানিতেছেন আর তাঁর পাশে বসিয়া ধীরেনবাবু হাসিমুখে যে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন তোমাদের অবগতির জন্য তা এখানে তুলিয়া দিলাম—

অনেক দিন যাবৎ বিলাতে বড়ো-বড়ো পণ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে বার্ধক্য, জরা ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া নূতন যৌবন বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ খানিকটা সফলও হইয়াছেন—বানরের গ্ল্যাণ্ড লাগাইয়া মানুষকে নূতন যৌবন দিবার চেষ্টার কথা কে না জানে? প্রফেসর ভড়েরও ইচ্ছা ছিল ঐরকম কিছু করিবার। প্রাচীন মিশরে নাকি এই ব্যাপারটা অনেক দূর আগাইয়াছিল—প্রফেসর ভড় কোথা হইতে সেই খবরটা পাইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সে পুঁথি জোগাড় করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ তাই লইয়াই দিবারাত্র পরীক্ষা করিতেন। শেষ দিন প্রফেসর ভড় সেই পুঁথি অনুযায়ী একটা ওষুধ তৈরি করেন কিন্তু সম্ভবত ওষুধের বিটকেল গন্ধ ও চেহারা দেখিয়া সাহস করিয়া খাইতে পারেন নাই। ওষুধ না খাইলেও দিবারাত্র ঐ এক চিন্তার ফলে ঐ সময়ে তাঁর মনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে ওষুধ না খাইয়াও হঠাৎ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে তিনি সত্যসত্যই নূতন করিয়া পুরানো জীবন ফিরিয়া পাইতেছেন। এসব বিষয়ে মন শরীরের উপর কী অসম্ভব রকম আধিপত্য করিতে পারে তা আধুনিক মনোবিজ্ঞান লইয়া যাঁরা চর্চা করেন তাঁরাই জানেন। প্রফেসর ভড়েরও তাহাই হইল। প্রথম দিন তাঁর ধারণা হইল তাঁর বয়স বুঝি কুড়ি-বাইশ বছরের বেশি নয়; —তাঁর আচারে ব্যবহারে ঠিক সেই ভাব দেখা দিল। তারপর তাঁর বিশ্বাস হইল তিনি আরও ছোটো হইয়া গিয়াছেন—একেবারে দশ-বারো বছরের ছেলে যেন। সেইদিনই বিকেলবেলা এই ব্যাপার ঘটে। তার-

পর আজ সকালে তিনি নিজের যে বয়স অনুমান করিলেন সেটা হাস্যকর হইলেও পূর্বোক্ত নিয়মে আশ্চর্যজনক নয়। ভগবানের দয়া, প্রফেসর ভড় সেই ওষুধটি মুখে দেন নাই—তাই যা-কিছু ব্যাপার মনের উপর দিয়াই গিয়াছে, শরীরের কোন পরিবর্তন আনে নাই। ঐ ওষুধে সত্য পরিবর্তন কিছু আনিত কি না বলা কঠিন, তবে ওষুধ তৈরিতে কোনও গলদ থাকিলে তাঁর জীবন বিপন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই। ধীরেনবাবু পুঁথি-পত্র, প্রফেসর ভড়ের নোট এবং নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া ছয় ঘণ্টার পর যখন এসব তথ্য সংগ্রহ করিলেন তখন প্রফেসর ভড়ের আরোগ্যলাভের পন্থা বাহির করিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না। কারণ যেখানে সম্পূর্ণ মানসিক, সেখানে কোনও উপায়ে মন হইতে সেই চিন্তা একেবারে ঠেলিয়া দিতে পারিলেই হইল। এবং এই কার্যে তিনি (ধীরেনবাবু) যে উপায় ঠাওরাইয়াছিলেন তা কিছু নিষ্ঠুর হইলেও সবচাইতে সহজ উপায়, সন্দেহ নাই।

ইহার কিছুদিন পরের ঘটনা। দোলাইগঞ্জে ঢুকিতে এখন আর সেই বিরাট চিমনিটা চোখে পড়ে না। ভড়-জায়ার নির্দেশে মিস্ত্রিরা সেটিকে এবং সেইসঙ্গে ল্যাবরেটরিটিকেও ছেনি ও শাবলের সাহায্যে নির্মূল করিয়া দিয়াছে।

ভুলের দেশে ভুলুবাবু

বিমল দত্ত

ইস্কুলের ছুটির পর সকলে একে একে বাড়ি চ'লে গেলো, কিন্তু ভুলুর ছুটি নেই। সে উঁচু বেঞ্চিতে মাথা রেখে ব'সে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আজ সে হোম-টাস্ক আনেনি ব'লে মহেশবাবু তাকে কন্‌ফাইন করেছেন।

ভুলু মনে-মনে নানারকম আজগুবি কল্পনা করতে লাগলো। একবার ভাবলে ফুস-মন্তরে সে যেন মহেশবাবু হ'য়ে গেছে। তার ইয়া মোটা গোঁফ গজিয়েছে। দু'গালে গোটা-দশেক পান পুরে কচর-মচর চিবুতে-চিবুতে সে ক্লাসে ঢুকছে। সামনেই দেখে নীল হাফপ্যাণ্ট পরে মহেশবাবু সত্যেনকে চিমটি কাটছেন। আর যায় কোথা? খপ্ করে তাঁর ঘাড় ধ'রে ভুলুবাবু তাঁকে বোর্ডের কাছে হিড়্-হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে এলো। তারপর? তারপর ইঁটের মতো শক্ত এক প্রশ্ন করলে—

যদি তিনটি ঘোড়া তিনি মিনিটে ৪৩ মণ ঝালছোলা খায়, তবে পরদিন তাহাদের কী অবস্থা হইবে?

মহেশবাবুর তো চক্ষুস্থির। একবার বোর্ডে হিজি-বিজি কাটেন—আবার মোছেন—আবার সেই হাত নীল হাফপ্যাণ্টে মোছেন—এমনি ক'রে তাঁর নীল হাফ প্যাণ্ট শাদা হ'য়ে গেলো। মনে-মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে ভুলুর ভারি ফুর্তি হ'তে লাগলো। সে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো—'কেমন জব্দ! কেমন জব্দ!'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে কে যেন মিনমিনে গলায় ব'লে উঠল, 'অতোটা উৎসাহ ভালো না হে।'

ভুলু চটেমটে হেঁকে উঠল, 'কে হে তুমি বেয়াদফ!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোণের দিকে চোখ পড়তেই তার বড় মায়া করতে লাগলো। সে দেখলে ছোট্ট একটি পাখি সেখানে ঝুম হ'য়ে ব'সে রয়েছে—তার সারা গায়ে পালকের বদলে চটচটে সবুজ শ্যাওলা।

পাখিটা ভারি বিমর্ষভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কি ভুলুবাবু, আমায় চিনতে পারছো না? আমি তোমার অসংখ্য ভুলের একটি।'

ভুলু তো ডবল অবাক। তার মুখে কথা জোগালো না। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল।

পাখিটা ভারি রেগে বললে, 'চিনতে পারছো না, না? অথচ অঘোরবাবুর ক্লাসে তুমিই সেদিন বললে যে—সোয়ালো (Swallow) মানে একরকম আশ্চর্য পাখি যার সারা গায়ে চটচটে শ্যাওলা। সেই থেকেই তো আমার এই দশা—'

ভুলু বললে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—'

পাখিটা বললে, 'থাক আর বেশি বুঝে কাজ নেই—তবে এইটুকু জেনে রেখো যে তোমাদের অত্যাচারে ভুলের দেশের লোক-সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। তোমরা ভাবো—যা-হোক কিছু ব'লে দিলেই হ'লো, বা ক'রে ফেললেই হ'লো। কিন্তু আজও তোমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান হয়নি। এ জগতে কিছুরই লয়-ক্ষয় নেই; একটা সামান্য ভুলেরও না। ভুলগুলো তোমাদের শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে জগতের কাছে আর ঘাড় তুলে দাঁড়াতে পারে না। ঠাট্টায়—বিদ্রূপে—হাসিতে—টিটকিরিতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তারা চোঁচাঁ দৌড় মারে ভুলের দেশে। বললে কথা বিশ্বাস করবে না—আমরা সেখানে মাচা বেঁধে বাস করছি। ইস্কুলের ছেলেগুলোর কি কামাই আছে। রোজ দেড়লাখ দু'লাখ ক'রে নতুন আমদানি। তাদের কষ্টের দিকে চাও, সেই মাতাপিতৃহীন অবোধ ভুলের জন্য তোমরাই যে আইনত দায়ী!'

এতক্ষণ একচোটে বক্তৃতা ক'রে পাখিটা হাঁফাতে লাগলো। ভুলু অবাক হ'য়ে বললে, 'ভুলের দেশ ব'লে বাস্তবিক একটা দেশ আছে নাকি?'

পাখিটা বললে, 'নিশ্চয় আছে। তুমি দেখতে চাও?'

ভুলু রাজি হ'য়ে গেলো। পাখিটা তখন ফর-ফর ক'রে ঘরের মধ্যে উড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেলো। ভুলু আশ্চর্য হ'য়ে দেখলে, কোথায় বা স্কুলবাড়ি—কোথায় বা কী—সে নতুন দেশে পৌঁছে গেছে।

পাখিটা বললে, 'এই যে ধোঁয়া দেখছো, এ হচ্ছে ধোঁয়াটে বুদ্ধির ধোঁয়া।'

একটু এগুতেই একটা ছোট্ট খোলা মাঠ—তাতে উল্টো ক'রে গাছ হয়েছে। শিকড় রয়েছে আকাশে কিন্তু পাতা টাতা দেখা যাচ্ছে না—বোধহয় মাটির তলাতেই আছে।

ভুলু আপন মনেই বললে, 'এখন কোন দিকে যাই?'

পাখিটা বললে, 'যেদিকে খুশি।'

ভুলু বললে, 'পথ ভুল করবো যে!'

পাখিটা বললে, 'তা তো করবেই—এখানে পদে-পদে ভুল করা ছাড়া আর অন্য পথ নেই।'

ভুলু বললে, 'যাক, বাঁচলাম। আচ্ছা এ দেশের রাজা কে?'

পাখিটা বললে, 'তার নাম ভ্রান্তি মহারাজ। সে একটা হিংসুটে কানা দৈত্য—এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের—এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের বিদ্বেষ জাগিয়ে দেয়।'

এই ব'লে পাখিটা ফর-ফর ক'রে উড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।...

ভুলু একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলো। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখলে সেই ঝোপের ধারে একটা লোক চষা জমিতে কি একরকম গুঁড়ো ছড়াচ্ছে। তার একটু নাকে ঢুকতেই ভুলু তো হেঁচেই খুন।

লোকটা এগিয়ে এসে বললে, 'কিহে, বিষম লাগলো নাকি? তা আর কী করছি বলো। আমারও বিষম লাগে—কিন্তু উপায় নেই। এ বছর পেঁয়াজ চাষ করতেই হবে। অনেক খুঁজে-পেতে এক ধামা

লঙ্কার দানা সংগ্রহ করেছি। লঙ্কা ঝাল ও ঝাঁঝালো—পেঁয়াজও তাই। কাজেই বেশ আশা করা যেতে পারে এবার পেঁয়াজ ফলবেই।'

ভুলু এই আজগুবি কথা শুনে তো অবাক! সে বললে, 'তা আপনি পেঁয়াজ পেতেন না কেন?'

লোকটা হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা ক'রে উৎকট হেসে বললে, 'সেসব চেষ্ট কি হয়নি ভেবেছো? একবার পেঁয়াজ পুঁতেছিলাম কিন্তু বললে কথা বিশ্বাস করবে না, সব বিলকুল বাঁধাকপি ফ'লে গেলো। এখানে কিছুই ঠিক হয় না, আম ফলে মাটির তলায়—কচু ফলে গাছের ডালে।...সবচেয়ে বিপদএই, যে আমার আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তোমার ক'মাস?'

ভুলু বললে, 'জানি না।'

লোকটা বললে, 'ওঃ, তোমার বুঝি এখনো পরীক্ষা হয় নি?'

ভুলু বললে, 'আমার পরীক্ষা দিতে বয়েই গেছে!'

লোকটা চোখ লাল ক'রে বললে, 'কী, পরীক্ষা দেবে না?'

শুনে তো ভুলু সেখান থেকে দে-দৌড়! অনেকক্ষণ দৌড়ে ক্লান্ত হ'য়ে সে একটা বাড়ির রোয়াকে ব'সে হাঁপাতে লাগলো। দেয়ালে ঠেসান দিতে গিয়ে দেখে একটা সাইন-বোর্ড—তাতে অস্পষ্ট ক'রে ভুল বানানে লেখা—

"পোরিখ্যা বিভাগ!"

ভুলু আবার দৌড় দিতে গেলো, কিন্তু বৃথা। বাড়িটার আশ্চর্য চৌম্বক ক্ষমতা! ভুলুকে কোন অদৃশ্য শক্তি হিড়হিড় ক'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা হল-ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিলে।

ভুলু দেখলে, একটা লম্বা টেবিলের সামনে সাতজন গম্ভীর-মুখ ন্যাড়া মাথা পরীক্ষক ব'সে ঘন-ঘন নস্যি নিচ্ছেন আর মোটা-মোটা বই থেকে শক্ত শক্ত প্রশ্ন বাছছেন। আর-এক ধারে পঞ্চাশ-ষাটটা কচি ও ধাড়ি গাধা মনের আনন্দে বেঞ্চিতে বসে বসে কচর-মচর পেন্সিল চিবুচ্ছে।

ভুলুকে দেখেই গাধার দল মহানন্দে হ্রেষা-ধ্বনি ক'রে তাকে ডাকতে লাগলো—'আরে এসো এসো, ভায়া।' যেন কতোকালের বন্ধু—কতো যুগ পরে দেখা।...

হঠাৎ একটা কালো, বেঁটে ও মোটামতো লোক বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে একটা কাগজ বার ক'রে পড়তে লাগলো : স্কুলের ছেলে—বয়স চোদ্দ—নাম ভুলুকুমার মিত্র—স্কুলের রিপোর্ট—নিরেট মূর্খ, বোকাচন্দ্র, গর্দভ ইত্যাদি—মাস্টারমশাইদের পিছন হইতে বক দেখাইতে ও পাশের ছেলেকে চিমটি কাটিতে ওস্তাদ...

কাগজখানা পড়া শেষ হ'লে বিচারকরা ভুলুকে ডেকে পাঠালেন। ভুলু দেখলে এ দেশে যারাই পরীক্ষক তারাই বিচারক। প্রধান বিচারক ভুলুকে বললেন, 'বন্দী, অনেকক্ষণ ধ'রে বিচার ক'রে দেখা গেলো যে তুমি ভয়ঙ্কর অপকর্মের জন্য দায়ী। সে-অপরাধ আর কিছু নয়, খুন—হত্যা। তুমি মাতৃভাষাকে হত্যার অপরাধে দোষী। সাধারণ জ্ঞানকে অজ্ঞান করবার গুরু অপরাধে তোমার শাস্তি—প্রাণদণ্ড।...'

অমনি একজন উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ধর্মাবতার, আপনি ভুল করছেন। ব্যাকরণ-হত্যা, আর নরহত্যা এক নয়। তাছাড়া বন্দীর বয়স অল্প। তার দোষ কালক্রমে শুধরে যেতে পারে।'

সাতজন বিচারক একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—'উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ।' প্রধান বিচারপতি বললেন, 'সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। ছোকরা এই বয়সে যে নমুনা দিচ্ছে, কালে সে বোধহয় ভ্রান্তি মহারাজের স্থান অধিকার করবে।'

একজন পরীক্ষক বললেন, 'বাংলার খাতায় লিখেছে—কোকনদ মানে ডাবগাছের ফল, অর্থাৎ খেজুর।'

দ্বিতীয় পরীক্ষক বললেন, 'বিজ্ঞানের প্রশ্নে লিখেছে—নীলনদ, লোহিত সাগর, পীত সাগর, কৃষ্ণ সাগর প্রভৃতি সাতটি সাগর বা নদীর জল সূর্য-কিরণে বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বে উঠিয়া রামধনুর সৃষ্টি করে।'

তৃতীয় পরীক্ষক বললেন, 'ইতিহাসের খাতায় লিখেছে—আকবর ও বাবর দুই ভাই। তাঁহারা লায়েক হইয়া একদিন রাত্রে দ্বিতীয় মশারি যুদ্ধ শুরু করেন।'

চতুর্থ পরীক্ষক বললেন—'Joan D'Arc was a glorious historical character—এর অনুবাদে লিখেছে—জোয়ানের আরক এক জ্বালাময় ঐতিহাসিক চর ও অভিনেতা।'……

আর বলতে হ'লো না। সাতজন বিচারক একসঙ্গে হেঁকে উঠলেন—'ফাঁসি—ফাঁসি—ফাঁসি—ফাঁসি—ফাঁসি—ফাঁসি—ফাঁসি।'

ভুলু তাই না শুনে সেখানে থেকে দৌড়। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। হঠাৎ শুনলে, পিছনে পায়ের শব্দ। চেয়ে দেখে, একটা ধনুকের মতো প্যারাবোলা আর দুটো ভালগার ফ্র্যাকশন তাকে তাড়া করেছে। ভালগার ফ্র্যাকশন তো ভালগারই হয়ে থাকে। তবে, প্যারাবোলাকেও ঐ দলে দেখে ভুলু মনে কষ্ট পেলে। জ্যামিতি তো সে মন দিয়ে পড়ে।

ততক্ষণে ফ্র্যাকশন দুটো ভুলুকে ধরে ফেলেছে। ভুলু দেখলে, দু'জনেরই মাথায় ফেট্টি বাঁধা। $\frac{৩}{১}\frac{৫}{০}\frac{১}{৭}$ বললে, 'তুমিই তো এই কাজ করেছ! খামাখা উপরে-নিচে কেটে দিয়েছ কেন বলো তো? সেই থেকে এখনও ঘা শুখোয় নি।' $১\frac{২}{১}\frac{৩}{}$ চেঁচিয়ে উঠলো, 'ধর তো ওকে, চাঁটিয়ে মাথা গরম করে দিই।' সঙ্গে-সঙ্গে একদল চ্যাংড়া a^2, x^3, $2xy$ ভুলুকে চিমটি কেটে অস্থির ক'রে তুললে।

ভুলু তখন সেই অঙ্কের ব্যূহের মধ্যে পড়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললে। তারপর?

নাঃ আজ আর না। এই গল্পটা ভুলুর হাতে পড়লে কি রক্ষা থাকবে আমার? আমার তেত্রিশখানা কবিতার খাতাই সে আগুন ধরিয়ে দেবে। তার চেয়ে সবুর করো—আগে কবিতাগুলো মাসিক পত্রে ছাপিয়ে ফেলি। তারপর ভুলুকে ডোণ্ট কেয়ার। তখন ভুলু-বাবুর বাকি অ্যাডভেঞ্চারটুকু শেষ করবো।

রাজপুত্রের ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে আছে।

রানী, রাজপুত্রের মা, গেছেন রাক্ষসের পেটে। রাজবাড়ির পুকুর-পাড়ে ন্যাড়া তালগাছে থাকে রাক্ষুসী।

রানীকে সে খেয়ে ফেলেছে। খেয়ে নিজে তাঁর বেশ ধ'রে রাজপুরীতে রানী হ'য়ে বসেছে।

কবে কখন যে এই কাণ্ড হ'লো কেউ জানে না। আর কেউ টেরও পায় নি। রাজপুত্র কিন্তু পেয়েছে। নইলে হঠাৎ রানীর মতিগতি বদলে গেলো কেন! আর বিশেষ ক'রে রাজপুত্রের উপরই বা তার এতো রাগ কেন! রোজ সকালে রানী—মানে পুরোনো রানী, রাজপুত্রের আসল মা—তাকে মিছরি-মাখন-বাদামের শরবৎ খাইয়ে দিতেন। ক'দিন ধ'রে তার বদলে সে খেতে পাচ্ছে খালি মস্ত-মস্ত কুইনিনের বড়ি। এমন বিচ্ছিরি তেতো লাগে খেতে, তবুও তাই খেতে হয়। না খেলে রানী—মানে নতুন রানী, আসলে সে রাক্ষুসী, জোর ক'রে তাকে গিলিয়ে তবে ছাড়ে। আগে সে সারাদিন খেতো কতো ভালো-ভালো সব খাবার। না খেতে চাইলে রানী—মানে সত্যিকার রানী—রাগ করতেন। চোখের জল ফেলতেন। এখন সে খাচ্ছে শুধু বাটি বাটি বার্লি-ওয়াটার। রসগোল্লা, রাবড়ি, শোনপাপড়ি দূরে থাক, এতো-যে ল্যাংড়া-ফজলি আমে বাজার ভেসে যাচ্ছে, তাকে এতটুকুন একটুকরো আমও কেউ দিচ্ছে না। অথচ আম খেলে কী হয়? ফ্রেশ ফ্রুট খুব বেশি ক'রে খাওয়া উচিত, একথা ডাক্তাররাই বলে না? রাজপুত্রের হাইজীন বইয়ে নেই এ-কথা লেখা?

আর অসুখই বা তার কী? জ্বর? জ্বর না হাতি। ও তো হয়েছে রাক্ষুসী রানী এ বাড়িতে এসেছে ব'লে। জ্বর-টর কিচ্ছু নয়, অ্যানিমিয়া। রাক্ষুসী রানী চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার রক্ত শুষে নিচ্ছে, তাই। নইলে রাক্ষুসী রানী যেদিন এলো ঠিক সেই রাত্তির থেকেই তার জ্বর হ'লো কেন? আগে তো হ'তো না। রাক্ষুসী রানীও এলো তারও জ্বর হ'লো, আর রাক্ষুসী রানী মনের আনন্দে তাকে কুইনিন খাওয়াতে শুরু করলো। তাই থেকেই তো সে টের পেলে, তার সে মা আর নেই, এ নতুন লোক; মনে হিংসে না থাকলে কেউ কাউকে কুইনিন খাওয়ায়? খালি-খালি বার্লি-ওয়াটার খাইয়ে রাখে? জ্বর, তো শরবৎ খাওয়ালেই হয়, নাইয়ে দিলেই হয়। জ্বর মানে তো গা গরম হওয়া। কুইনিনেই যদি ঠাণ্ডা হ'তো তবে আর লোকেরা আইসব্যাগ মাথায় দিতো না, দার্জিলিং, সিমলে পাহাড়ে যেতো না। কিছু নয়, শুদ্ধু তাকে মেরে ফেলবার মতলব।

অথচ এখন কী করা যায়? রাজাকে বলতে গিয়ে লাভ নেই। তিনি মোটেই বিশ্বাস করবেন না। রাক্ষুসীর মায়ায় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন।

আর কাউকে বলতেও ভয় করে। রাক্ষুসী রানী যদি টের পায় সে সন্দেহ করছে, তবে আর রক্ষে থাকবে না। তক্ষুনি নিজমূর্তি ধারণ করবে।

এক বলা যেতো মন্ত্রীপুত্রকে। বয়সে সে অবশ্য রাজপুত্রের চেয়েও এক বছরের ছোটো, কিন্তু তবু তার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আর, মোটেই ছ্যাবলা নয়, কথা পেটে রাখতে জানে। কিন্তু হ'লে হবে কী, সেও ক'দিন ধ'রে আসছে না। সেদিন এসেছিল, চাদরের তলায় ক'রে লুকিয়ে এনেছিল কাঁচা আমের ঝাল-আচার। কিন্তু মুখে দিতে-না-দিতে রাক্ষুসী রানী হাঁ-হাঁ করে এসে পড়লো। রাজপুত্রের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে। মন্ত্রীপুত্রকে বললে, 'তুমি যাও বাছা, তোমায় এখানে আর আসতে হবে না।'

মন্ত্রীপুত্র চুপ ক'রে রইল। রানী কঁ্যাট-কঁ্যাট করতে লাগলো, 'ছেলেটার অসুখ, আর তুমি ওকে আচার এনে খাওয়াচ্ছ। দেবার হ'লে কি আমরাই দিতাম না? না আমের আচার আমাদের ঘরে নেই?'

মন্ত্রীপুত্র মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে গিয়েছে। আর আসে নি।

উঃ, কী জোচ্চোর! 'আমরাই কি দিতাম না!' যেন কতই দিচ্ছে! ইচ্ছে করে তলোয়ার খুলে দিই এক কোপ!

কিন্তু তলোয়ারের কোপে তো সে মরবে না, সেই হচ্ছে মুশকিল। রাক্ষুসীদের প্রাণ তাদের নিজেদের মধ্যে থাকে না। কোথায় সেই ভ্রমর-ভ্রমরীর মধ্যে তার প্রাণ আছে রাজপুত্র অবশ্য জানে। বইয়ে সে পড়েছে। কিন্তু এখন সেখানে যায় কী ক'রে? ডাক্তার বলেছে তার হাঁটা-চলা, বাইরে বেরোনো একদম বারণ।

আর এক পাজি হয়েছে এই ডাক্তারটা! নিশ্চয় রাক্ষুসী রানীর কাছে ঘুষ খায়। নইলে কেন খালি খালি বলে রাজপুত্রকে কুইনিনই খেতে হবে? বার্লিই খেতে হবে? ভালো মিষ্টি ওষুধ নেই তার ডিস্পেন্সারিতে? ভাত আজকাল রাজপুরীতে রান্না হচ্ছে না? পৃথিবীসুদ্ধ চকোলেট লজেঞ্চুস সব ফুরিয়ে গেছে?

রাজপুত্র ভাবলে, রাজাকে বলা তো যাবে না, শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী-মশাইকেই বলতে হবে, যা থাকে কপালে। কাল ভোরবেলা মন্ত্রীমশাই তাকে দেখতে আসবেন। রোজই আসেন। তখন মনে মনে সঙ্কল্প স্থির ক'রে রাজপুত্র সে-রাত্রে ঘুমুলো।

বলা কিন্তু হ'লো না। সকালবেলায় রাজপুরীতে হৈ-চৈ কাণ্ড। অনেকখানি বেলা হ'লো, রানী এখনো ওঠেন নি, দোর খোলেন নি। অসুখ-বিসুখই হ'লো নাকি! রাজমাতা নিজে এসে দু' দু'বার ক'রে দোরে ধাক্কা দিয়ে গেলেন। তবু সাড়া নেই।

পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রাজপুত্র সব শুনছে, আর মনে মনে হাসছে। তার কাছে তো কিছুই অজানা নেই। অসুখ না

ঘোড়ার ডিম। নিশ্চয় রাক্ষুসী পালিয়েছে। রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হয়েছে, সেই কথা টের পেয়েছে আর-কি।

আরো অনেক—অনেক পরে রাক্ষুসী রানী দোর খুললে। দুই চোখ ফুলো-ফুলো। গলা থেকে বিকট রাক্ষুসে আওয়াজ বেরোচ্ছে। মুখটা ভার হ'য়ে এতো বড় হয়েছে। নিজমূর্তি ধরবার পূর্বলক্ষণ।

সবাই কিন্তু তা বুঝলো না, ব্যস্ত হ'য়ে বললে, 'একি! কী হ'লো রানীমা, চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?'

রানী 'হ্যাঁচ্ছো' ক'রে বিদঘুটে রকম হাঁচলে। বললে, 'অসুখ করেছে। সারা গায়ে ব্যথা।'

সবাই মহা কোলাহল ক'রে বললে, 'তবে উঠো না, উঠো না, শুয়ে থাকো।'

রাজপুত্র বুঝলে। অসুখ আর কিছু নয়, হাড়মুড়মুড়ি ব্যারাম। সব সিমটম মিলে যাচ্ছে দেখছ না? তার সন্দেহ মিথ্যা নয়। রাক্ষুসী টের পেয়েছে।

ডাক্তার এল। দেখে বললে, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

রাত জেগে ঠাণ্ডা লেগেছে। রুগীকে নিয়ে জাগতে হচ্ছে কিনা!

বা রে আবদার! দোষ এখন রাজপুত্রের! কে বলেছিল তার অসুখ বানিয়ে দিতে? কে বলেছিল রানীকে রাত জাগতে?

ডাক্তার বললে, 'শুয়ে থাকতে হবে। খুব গরম লাগাতে বে। ওষুধ খেতে হবে।'

রাক্ষুসী রানী ককিয়ে বললে, 'মাথাটা খ'সে যাচ্ছে! একটু অরেঞ্জ পিকোর পাঁচন দাও, নইলে গেলাম!'

ডাক্তার বললে, 'উত্তম প্রস্তাব। মহারাজ, ব্যবস্থা করুন।'

রাজপুত্র সব শুনলে। বইয়ের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। অরেঞ্জ পিকো আনা কি সোজা কথা রে দাদা?

এ-রাজার দেশ, সে-রাজার দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পেরিয়ে, আসাম পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, বন ভেঙে যেতে হবে। সে বনে কিলবিল

করছে বাঘ, হাতি, পাইথন। বনের ওধারে গিয়ে হেড-হাণ্টার রাক্ষসদের দেশ, সেই দেশে পাহাড়ের মাথায় জন্মায় শ্যামপর্ণী বৃক্ষের গাছ।

তারই কচি-পাতার কুঁড়ি রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে তারা সাতপুরু টিনের কৌটোয় পুরে রেখে দেয়; সে কৌটোর জানলা নেই, দরজা নেই, আলো ঢোকে না সেখানে, হাওয়া ঢোকে না। সেই গুঁড়োর নাম অরেঞ্জ পিকো। ঝাঁজ কী তার!—ছোট্ট একচামচে গুঁড়ো একবাটি জলে এক মিনিট ভিজিয়ে সেই জল ছেঁকে নিয়ে বড়োলোক বড়োলোক রাক্ষসেরা সকালে এক বাটি বিকেলে এক বাটি ক'রে খায়; সাতশো রাক্ষসে কৌটো ঘিরে দিবারাত্র পাহারা দেয়। সেই কৌটো চুরি ক'রে আনতে যাবে কে?

যাবে কে তা বোঝাই যাচ্ছে, যাবে রাজপুত্রই। তার জন্যেই তো এতো কাণ্ড! দেখো না, কালই রাক্ষুসী রাজাকে বলবে, রাজপুত্রকে পাঠানো হোক।

বটে! রাজপুত্রকে পাঠানো হোক, যাতে তাকে রাক্ষসেরা ধ'রে খেয়ে ফেলতে পারে, কেমন তো? সেটি আর খেতে হচ্ছে না! আসুকই না, রাজপুত্রও দেখে নেবে কত বড় রাক্ষসী সে। যাবে সে অরেঞ্জ পিকো আনতে। আজই যাবে। বলবার অপেক্ষা করবে না, আজ রাত্রেই কাউকে না ব'লে-ক'য়ে চুপ-সে বেরিয়ে পড়বে। রাক্ষসের পুরীতে দিঘির তলায় স্ফটিকের স্তম্ভে কোথায় রাক্ষসদের প্রাণ থাকে সে জানে। একেবারে সব রাক্ষস মেরে ফেলে জন্মের মতো অরেঞ্জ পিকো খাইয়ে দেবে রাক্ষুসী রানীকে। তখন বুঝবে মজা! ভেবেছে, রাজপুত্র 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়েনি, না? বই বলে তার মুখস্থ —হুঁ হুঁ বাবা, তার সঙ্গে চালাকি!

নিশুতি রাত। রাজপুরীতে কেউ জেগে নেই, লোকলস্কর, হাতি-ঘোড়া, পাখ-পাখালি সবাই ঘুমুচ্ছে।

রাজপুত্র কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুমোলে পরে যদি সময়-মতো জাগতে না পারে? ঘড়িতে তো অ্যালার্ম দেওয়া চলবে না।

সবাই যখন ঘুমে অচেতন, রাজপুরী নিঃসাড় নিঃশব্দ, তখন রাজপুত্র বিছানা ছেড়ে উঠলো। ধুতি ছেড়ে হাফ প্যাণ্ট হাফ শার্ট পরলে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে নিলে। নিয়ে সাবধানে দোর খুলে দুর্গা স্মরণ ক'রে পা বাড়ালে।

পক্ষিরাজকে নিতে পারলে হ'তো। কিন্তু পক্ষিরাজ আস্তাবলে ঘুমুচ্ছে। এখন তাকে বার ক'রে আনা শক্ত। যদি সহিসরা কেউ জেগে ওঠে? বা পক্ষিরাজই আচমকা ঘুম ভেঙে চিঁহিঁ ক'রে ওঠে? কাজ নেই ঝঞ্চাটে, তার চেয়ে সে হেঁটেই যাবে।

রাজপুরীর সীমানা পেরিয়ে, শহর ছাড়িয়ে বাইরে এসে রাজপুত্র নিশ্বাস ছাড়ল। আর ধরা পড়বার ভয় নেই।

হেঁটে—হেঁটে—হেঁটে—এ-রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে, সে-রাজার রাজ্য পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যখন পড়লো তখন ভোর হ'য়ে এসেছে।

সেখান থেকে তেপান্তরের মাঠ ঠিক একদিনের পথ। কিসে ক'রে গেলে একদিনের পথ বা ক'জনে মিলে গেলে একদিনের পথ, সেসব কিছু কথা নেই। নিয়ম হচ্ছে, রাস্তা ধ'রে সোজা নাক বরাবর চলতে হবে।

যেতে যেতে যেতে যেতে যেখানটাতে গিয়ে সন্ধ্যা হবে, সামনে পেছনে আর পথ দেখা যাবে না, চারিদিকে খালি অন্ধকার আর গা-ছমছম,—সেইটাই হচ্ছে তেপান্তরের মাঠ। রাজপুত্র হাঁটতে লাগলো।

সমস্ত দিন রাজপুত্র হাঁটলো। কোথাও থামলো না, বসলো না। চারটে পয়সা পকেটে ছিল, এক পয়সার শুধু মুড়ি কিনে খেলে।

হেঁটে হেঁটে সন্ধেবেলা তেপান্তরের মাঠের কিনারায় রাজপুত্র এসে পৌঁছলো। সূর্য তখন পাটে বসেছে। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। রাজপুত্র দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। না, ভুল হয় নি, ঠিকই সে এসেছে। ঐ-যে হোই দূরে উইঢিবির উপর শিমুল গাছটা। ঐ গাছে থাকে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী। তাদের কাছে একটা বাচ্চা চেয়ে নিতে হবে। সবাই নেয়।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রাজপুত্র শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। তলোয়ার বার ক'রে তার ধারে বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুলটা একটুখানিক চিরে নিলে। আঙুল বেয়ে রক্তের ধারা নামলো। ডান হাতে আঙুল চেপে ধ'রে রাজপুত্র ডাকলে—'গাছে কে আছেন?'

হাজার হোক ব্যাঙ্গমা অনেক কালের লোক। নাম ধ'রে ডাকতে কেমন-কেমন লাগে।

একবার ডাকলে, দু'বার ডাকলে, তিনবার ডাকলে, সাড়াশব্দ নেই। রাজপুত্র এবার খুব চেঁচিয়ে বললে, 'দেখুন, শুনছেন?'

এইবার গাছের উপর থেকে জবাব এল। কচি গলায় কে বললে, 'কে?'

রাজপুত্র বললে, 'আমি। রক্ত এনেছি।'

কচি-গলাটা চেঁচিয়ে বললে, 'মা, অ মা, ফেরিঅ'লা এয়েচে।' তারপর একটা বড় মানুষের গলা শোনা গেলো। কী ক্যাককেরে গলা, যেন করাত দিয়ে টিন কাটছে। গলা বললে, 'কে গা?'

রাজপুত্র বললে, 'রক্ত এনেছি। নিয়ে যান।'

গলা বললে, 'রক্ত! রক্ত কী হবে? রক্ত আমরা খাই নে। আমরা খাই মাছ।'

সেকি কথা! বইয়ের সঙ্গে তো মিলছে না! নিশ্চয়ই পার্ট ভুলে গেছে। মুখস্থ নেই, তাই বানিয়ে বলছে। কিন্তু এখন তো রাজপুত্রকেই সামলে নিতে হয়। ভেবে-চিন্তে রাজপুত্র বললে, 'খাবার জন্যে নয়। চোখ ফোটাবার জন্যে

—'চোখ ফোটাবার জন্যে! চোখ আবার ফুটবে কী! চোখ কি পদ্মফুল? না বাবলাকাঁটা?'

আবার আবোল-তাবোল বলে! রাজপুত্র ভাবলে, এটা বোধহয় ঝি-টি কেউ হবে, জানে না। বললে, 'আপনি বোধহয় জানেন না। ওঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

—'কাদের আবার জিজ্ঞেস করবো।'

—'গাছের ভেতরে জিজ্ঞেস করুন। মিঃ ব্যাঙ্গমদের গাছ এইটেই তো?'

—'না তো! এটা চিলেদের গাছ।'

তা কী ক'রে হয়! না, এই তো সেই শিমুল গাছ, রাজপুত্রের চিনতে ভুল হয় নি। একটু থেমে বললে, 'মিঃ ব্যাঙ্গমরা কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

—'কে জানে বাছা! ব্যাঙ-ট্যাঙ চিনি নে।'

—'আজ্ঞে ব্যাঙ নয়, ব্যাঙ্গমা। এইখানেই তো ছিলেন।'

—'সে তারা এখন নেইকো। উঠে গেছে।' জানে না কচুও, তবু বুড়ি চাল মেরে দিলে।

—'উঠে গেছেন? কেন?'

—'তা কী ক'রে বলবো! ভাড়া-টাড়া বাকি প'ড়ে থাকবে।'

—'কোথায় গেছেন তাঁরা, বলতে পারেন?'

—'না।'

—'ঠিকানা রেখে যান নি? চিঠিপত্তর যদি আসে?'

—'অত-শত জানিনে বাবু। এখন বকিয়ো না তো! দেখছো লোকটা ঘুমুচ্ছি।'

—কী অসভ্য? যেন ব্যাঙ্গমদের বাড়িটা ব'লে দিয়ে তারপর ঘুমোনো যেত না! একেবারে ছোটোলোক। হবে না, চিল তো।

কিন্তু ছাড়লে হবে না তাই ব'লে, ঠিকানা তার জানা চাই-ই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাজপুত্র জোরসে গাছের কড়া ধ'রে নাড়া দিলে—খট খট খটাখট। এবার ওপর থেকে ভারি হেঁড়ে গলায় সাড়া এলো, 'কে?'

—'আমি রাজপুত্র।'

—'রাজপুত্র, তা এখানে কেন? এটা রাজসভা নয়।'

—'তা জানি। তার জন্যে নয়, এটা ক' নম্বর গাছ বলুন তো।'

—'কেন, সে খবরে তোমার কী দরকার হে?'

—'দরকার না থাকলে কি আর শুধোচ্ছি?'

রাজপুত্রের গলা গরম হ'য়ে উঠলো। কত আর সওয়া যায় মশায়?

হেঁড়ে-গলাও চ'টে উঠলো: 'কে হে তুমি ছোকরা! খুব যে চড়া-চড়া কথা বলছো?'

সঙ্গে সঙ্গে টিন-কাটা গলাটা চ্যাঁ ক'রে উঠলো: 'ঐ তো গো এতক্ষণ ধ'রে জ্বালাচ্ছিল। কে ব্যাঙ না কে কোথায় ছিলো, তা সে কোথায় গেলো, তবে কেন গেলো—তার কী বৃত্তান্ত সব ওঁকে ব'লে দাও। আবদার কত!'

হেঁড়ে-গলা বললে, 'নম্বর-টম্বর এখন বলা হবে না। ডিসেম্বর অবধি মাইনে চুকিয়ে দিয়েছ?'

ব'লেই দ্রাম ক'রে দোতলার জানলা বন্ধ ক'রে দিলে।

রাজপুত্র অবাক হ'য়ে গেলো। কী ইতর লোকগুলো! হাতের তলোয়ারটা তলোয়ার না হয়ে কুড়ুল যদি হ'তো, রাজপুত্র গাছের গুড়ি দু' ফাঁক না ক'রে নড়তো না!

কিন্তু এদের উপর রাগ ক'রে ব'সে থেকে লাভ নেই। রাজপুত্র এগিয়ে চললো।

এক পা, দু'পা, তিন পা গিয়ে অন্ধকারে হেঁই ক'রে মাথায় এক গুঁতো। থেমে দেখলে, বিরাট এক গাছ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চ'টে গিয়ে গাছের গায়ে এক ঘুসি মেরে বললে, 'পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, হর্ন দাও না কেন?'

গাছের উপর থেকে কে বললে, 'কে কথা বলে?'

—'আমি রাজপুত্র।'

—'আরে এসো, এসো, এসো, উঠে এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে রাজপুত্র উঠে গেলো। দোতলার এক ডালে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ব্যাঙ্গমা শুয়ে আছে। বললে, 'এসো ভাই, এসো। তারপর, শরীর গতিক ভালো তো?'

ময়লা ছেঁড়া কাঁথার বিছানা গন্ধ ছাড়ছে। কী আর করে, তারই এক কোণে আলগোছে ব'সে প'ড়ে রাজপুত্র বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন আজকাল ?'

ব্যাঙ্গমা বললে, 'আর ভাই থাকা-থাকি, এখন গেলেই বাঁচি। ম্যালেরিয়া যা ধরেছে, শরীরে আর পদার্থ নেই।'

রাজপুত্র চারিদিক চেয়ে দেখলে। ব্যাঙ্গমী, বাচ্চারা—কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বললে, 'এঁরা সব কোথায় ?'

—'কেউ নেই বাড়িতে। বড়ো ছেলে বিদেশে চাকরি করে, গিন্নি আছেন তার ওখানে। ছোটো ছেলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। তামাকটুকু সেজে দেবার লোক নেই।'

কাজ গোছাতে হলে সবই করতে হয়।

রাজপুত্র বললে, 'কল্‌কে হুঁকো কোথায় ?'

ব্যাঙ্গমা বললে, 'ঐ কোণে তো ছিলো।'

কল্‌কে খুঁজে রাজপুত্র তামাক সেজে দিলে। তামাক খেয়ে-টেয়ে ব্যাঙ্গমা বললে, 'তোমার হাতে ও কী ?'

রাজপুত্র বললে, 'রক্ত এনেছিলাম খানিকটা।'

ব্যাঙ্গমা বললে, 'কিন্তু রক্ত তো এখন দরকার নেই। ছেলেরা সব বড়ো হয়ে গেছে। নাতিপুতি এখনও হয়নি।'

যাচ্চলে! রাজপুত্র বিরক্ত হয়ে বললে, 'সে কথা আগে বললেই হ'তো।'

—'কী হ'তো ?'

—'আঙুলটা কাটতাম না তা'হলে! তামাক লেগে যা টাটাচ্ছে!'

—'আঙুল কেটেছো বুঝি! আহা, নিয়ে এসো, একটু থুতু লাগিয়ে দিই। টিংচার আইডিন গাছে নেই কিনা!'

থুতু! নাক মুখ সিঁটকে রাজপুত্র হাত বাড়িয়ে দিলে।

হোয়াক থু ক'রে ব্যাঙ্গমা ইয়া বড় এক ডেলা থুতু তুললে।

তুলে তাই দিয়ে আঙুল জুড়ে দিলে। চমৎকার, দেখে কে বলবে রিপু করা। রাজপুত্র খুশি হ'য়ে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

ব্যাঙ্গমা বললে, 'তা এই রাতে কেন এসেছো তা বললে না ?'

রাজপুত্র বললে, 'বলে আর কী হবে ? ছেলেরা নেই, আপনারও তো দেখছি অসুখ।'

—'আহা বলোই না, শুনতে তো আর দোষ নেই।'

—'তা নেই। এসেছি রাক্ষসের দেশে যাবো। অরেঞ্জ পিকো আনতে হবে।'

—'তবেই হয়েছে। উড়বো যে, সে শক্তিই নেই। একে জ্বরে ভাজা-ভাজা, তায় পাখার স্প্রিংয়ে গেঁটেবাত ধরেছে। বুড়ো হয়েছি তো এখন।'

রাজপুত্র বললে, 'যাক গে, কী আর করবো, হেঁটেই চলে যাই।'

ব্যাঙ্গমা ভেবে বললে, 'হেঁটে তো যেতে পারবে না, অনেক দূর। তা এক কাজ করো না। সাইকেল চড়তে জানো ?

—'ভালো জানিনে। একটু-একটু শিখেছি। যদি আছাড় খাই ?'

—'খেলেই বা। কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না। তেপান্তরের মাঠে জন-মানুষ নেই।'

তা বটে। কেউ যদি দেখে ফেলে তবেই লজ্জা। নইলে আর আছাড় খেতে দোষ কী ! রাজপুত্র বললে, 'আচ্ছা।'

ব্যাঙ্গমা বললে, 'তবে যাও, সিঁড়ির ঠিক নিচেই সাইকেল পাবে। ছোট ছেলে বিয়েয় পেয়েছিল, চড়ে-টড়ে না, পড়েই থাকে। ফেলে রেখে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি নিয়ে যাও।'

ব্যাঙ্গমাকে নমস্কার ক'রে রাজপুত্র গাছ থেকে নেমে এলো।

মন্ত্রঃপূত র‍্যালে সাইকেল, চ'ড়ে বসতে-না-বসতে হু-হু ক'রে ছুটে চললো। প্যাডল করতে হয় না, হ্যাণ্ডল ঘোরাতে হয় না, খালি চেপে ব'সে থাকলেই হ'লো। মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে, নদী-নালা

লাফিয়ে, পাহাড় টপকে সাইকেল গিয়ে একেবারে সেই রাক্ষসপুরীর দোরে থামলো।

রাত তখন ন'টা বাজে। রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই চরতে বেরিয়ে গেছে। এক লেবু-ঝোপের মধ্যে সাইকেলখানাকে লুকিয়ে রেখে রাজপুত্র পুরীর মধ্যে ঢুকলো।

যা ভেবেছিল ঠিক, অত বড়ো সাতমহলা পুরী, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। থাকবে না সে তো জানা কথাই। এখন রাজকন্যা গেলো কোথায়? তাকে খুঁজে না বার করলে তো চলবে না।

রাজপুত্র খুঁজে খুঁজে ঘুরতে লাগলো।

এ-ঘর সে-ঘর, এ-মহল সে-মহল ক'রে ঘুরতে ঘুরতে শেষে তিনতলার এক ঘরে গিয়ে রাজকন্যার দেখা মিললো।

দুধের ফেনার মতো তুলতুলে নরম আর শাদা বিছানার উপর ফার্স্টক্লাশ রামধনু-রঙা জাপানি ছিটের বালিশ মাথায় দিয়ে রাজকন্যা ঘুমোচ্ছে। টকটকে কাঁচা সোনার রং, তেমনি মুখের শ্রীছাঁদ, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। আর ঘুমোবার ভঙ্গীটিই বা কী সুন্দর—একেবারে বই থেকে টানা মুখস্থ। দেখে-দেখে রাজপুত্রের মনে হ'লো, ঘুমের কোশ্চেনটায় রাজকন্যা দশের মধ্যে দশ নম্বরই পেয়ে যাবে।

কিন্তু এখন খালি তার ঘুমোলে তো চলবে না। ভোর রাত্রে রাক্ষসেরা ফিরে আসবে, তার মধ্যে কাজ সারা চাই। রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে হচ্ছে। সোনার কাঠিটা কোথায় গেলো?

রাজপুত্র খুঁজতে লাগলো। টেবিলের ড্রয়ারে, আলমারির মাথায়, মশারির ছাতে, বালিশের তলায়—কোথাও নেই। খুঁজে খুঁজে শেষে একেবারে বিছানার শতরঞ্চি তুলে তার তলা থেকে বেরুলো সোনার কাঠি। সোনার নয় কিন্তু। কাগজের মস্ত বড় ভারি বই। পিজবোর্ডের মলাট, রঙিন ছবি। চমৎকার ছাপা, চমৎকার বাঁধাই। ব্যস, আর যায় কোথা, বই খুলে রাজপুত্র পড়তে বসে গেলো। বই পড়া তার রোগ-বিশেষ, পেলে আর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না।

রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে, আর তার শিয়রে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে ব'সে রাজপুত্র বই পড়ছে। একটা গল্প পড়া হ'য়ে গেলো। দুটো গল্প। তিনটে। পড়তে পড়তে রাজপুত্রের ঝিমুনি এলো। ঝিমুতে-ঝিমুতে যেই টাল খেয়েছে অমনি হাত ফস্‌কে সেই দেড়সেরি সোনার কাঠি ঠকাস্ ক'রে রাজকন্যার মাথার উপর। 'উঃ। কে রে পাজি!' ব'লে রাজকন্যা লাফিয়ে উঠলো। তারপর রাজপুত্রকে দেখেই জিব কেটে লজ্জায় অধোবদন।

রাজপুত্র বললে, 'ভয় পেয়ো না কন্যা, আমি রাজপুত্র।'

রাজকন্যা সামলে নিয়ে বললে, 'ভয় পাইনি, লজ্জা পেয়েছিলাম; না জেনে গাল দিয়ে ফেললাম কিনা!'

রাজপুত্র বললে, 'গাল দিয়েছ? কই শুনতে পাইনি তো!' শুনতে সে ঠিকই পেয়েছে। কিন্তু এ-রকম পরিস্থিতিতে এক-আধ লাইন মিথ্যে বলায় পাপ নেই।

রাজকন্যা তার পাশে পা ঝুলিয়ে বসলো। বললে, 'আমার উপর রাগ করো নি?'

—'রাগ কেন করবো? আমি বলে তোমাকে উদ্ধার করতে এলাম! তোমার সঙ্গে আমার ভাব।'

—'ভাব। কিন্তু আমাকে উদ্ধার করতে এলে কী? কী হয়েছে আমার?'

রাজপুত্র ভাবলে, বলি। আহা, রাক্ষসের মায়ামন্ত্রে ওকে সব কথা ভুলিয়ে রেখেছে! আবার ভাবলে, থাক, বলবো না। ছেলেমানুষ, জানলেই তো ভয় পাবে।

তারপর ভাবলে, আচ্ছা, একটু কৌশল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিই না, জানে কি না।

রাজকন্যা বললে, 'কথা বলছো না যে? কী ভাবছ?'

রাজপুত্র বললে, 'কিছু না। আচ্ছা, তোমার বাবা, তোমার মা এঁরা সব কোথায়?'

রাজকন্যা বললে, 'বাবা অ্যাসেম্বলিতে গেছেন।'

—'অ্যাসেম্বলি? সে কাকে বলে?'

—'কোথাকার বোকা তুমি! বাঙাল বুঝি?'

—'বাঙাল মানে?'

—'কিছু না। অ্যাসম্বলি হচ্ছে যেখানে ব'সে সব আইন তৈরি হয়। খবরের কাগজে পড়ো না?'

—'ও, রাজসভা! তাই বলো।'

—'ওই হ'লো। আর মা গেছে মামার বাড়ি। আমার সামনে সেকেণ্ড টার্মিনাল কিনা, তাই আমায় নিয়ে যায় নি।'

বেচারি! এইসব মিথ্যে কথা ব'লে ব'লে ওকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। আচ্ছা, রাজপুত্রও দেখে নেবে। এর যদি না শোধ নেয় তো তার নামই নয়।

রাজকন্যা বললে, 'তুমি কে তা বললে না?'

রাজপুত্র বললে, 'বললাম যে, রাজপুত্র।'

—'কোথাকার রাজপুত্র?'

—'আছে। অচিন দেশের।'

—'অচিন? ভূগোল বইয়ে তো নাম পাইনি! চায়না নয় তো? বা ইণ্ডোচায়না?'

—'না।'

রাজকন্যা উঠে গিয়ে ভূগোল বই নিয়ে এলো। পৃথিবীর ম্যাপ খুলে বললে, 'দেখিয়ে দাও না, কোন্ জায়গাটা তোমার দেশ?'

নাঃ, মেয়েটা বড্ড ডেঁপো। ও এটা কি পরীক্ষার হল পেয়েছে? না রাজকন্যা তার হেডমাস্টার? রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'ম্যাপে নেই।'

—'কেন? ও, বুঝেছি। খুব ছোটো রাজ্য বুঝি, তাই। না?'

—'না। খুব বড় রাজ্য, ম্যাপে ধরে না। তাই।'

—'ও!'

আবার বললে, 'এখানে তুমি এলে কী ক'রে ?'

রাজপুত্র বললে, 'উঃ, আসতে কি একটু কষ্ট ? এ-ঘর খুঁজেছি, ও-ঘর খুঁজেছি—একতলা আর দোতলাটা সমস্ত ঘুরেছি তবে না এইখানে এসে পেলাম তোমাকে।'

—'এমা, একতলা দোতলাতে গিয়েছিলে ? সেগুলোয় তো সব ভাড়াটেরা থাকে!'

—'তা আমি কী ক'রে জানবো ? দেখলাম না তো কাউকে।'

—'ওরা আজ সিনেমাতে গেছে, "বয়েজ টাউন" দেখতে।'

—'তা যাক, তুমি আর দেরি কোরো না তো। ওঠো।'

—'কোথায় উঠবো ?

—'বললাম যে, আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। মানে, রাক্ষসেরা সব আছে না ?'

—'রাক্ষস!'

রাজকন্যা যেন খুব বিস্মিত হ'লো শুনে। তারপর বললে, 'ওহো, বুঝেছি। বইটার কথা বলছ তো ? কিন্তু রাক্ষস তো নেই ওতে! রাক্ষসের গল্প এখন আর কেউ পড়ে না। ভূতের গল্প আছে একটা।'

নাঃ, একে কিছু বোঝানো শক্ত! একেবারে নিরেট মাথা! যাক আপাতত উদ্ধার তো করা যাক, পরে বুঝিয়ে দিলেই চলবে।

রাজপুত্র বললে, 'যাক গে রাক্ষস। তা এটাকে সতরঞ্চির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ? সোনার কাঠি তো থাকে বালিশের তলায়।'

—'হ্যাঁ, যেমন তোমার বুদ্ধি! বালিশের তলায় রাখি আর পিসিমা এসে ধরে ফেলুক! বললাম না, এগজামিন সামনে ?'

কী যে মাথামুণ্ডু সব বলে, বোঝাই যায় না ছাই! রাজপুত্র বললে, 'যাক। তা সোনার কাঠি, তো এ রকম ক'রে বানিয়েছ কেন ? নাম না লেখা থাকলে তো চিনতামই না দেখে।'

—'ও নতুন এডিশনে ঐ রকম করেছে।'

—'ধ্যেৎ, বাজে। কাগজের নাকি সোনার কাঠি হয় কখনো?'

—'বা রে, তবে কিসের হবে শুনি? সত্যি সোনার?'

—'না তো কি আনারসের?'

—'তবেই হয়েছে! সোনার এখন দাম কতো, জানো? ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা ক'রে ভরি।'

ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা! রাজকন্যার যা নাদুস-নুদুস দেহ, পাক্কা সওয়া মণ ওজন হবে। সওয়া মণে হ'লো গিয়ে তাহ'লে পঞ্চাশ সের—তার মানে পঞ্চাশ সের ইন্টু আশি ভরি ইন্টু ছত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা।

রাজপুত্র মনে-মনে হিশেব করতে লাগলো। মস্ত বড় অঙ্ক হ'য়ে পড়ে, খানিকদূর হ'য়ে খালি গুলিয়ে গুলিয়ে যায়।

রাজকন্যা বললে, 'আমার দিকে চেয়ে দেখছো কী? আমার গায়ের রং? এটা আসল সোনা নয়, রোলড্ গোল্ড।'

—'রোলগোল্ড? সে কাকে বলে?'

—'কোথাকার বাঙাল এটা! কত বয়স তোমার তাই শুনি? কোন ক্লাসে পড়ো?'

কেন, সে খোঁজে রাজকন্যার কী দরকার? রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'তোমার বয়স কতো?'

রাজকন্যা পিঠ টান ক'রে বললে, 'দশ বছর।'

রাজপুত্র বুক চিতিয়ে বললে, 'আমার বারো। এবার?'

রাজকন্যা বললে, 'মোটে তো দু'বছর! আমার চেয়ে তুমি এই এত্তোটুকুন মোটে বড়ো।' বাঁ হাতের বুড়ো-আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে সিকি-ইঞ্চি প্রমাণ ফাঁক ক'রে রাজকন্যা রাজপুত্রকে দু'বছরের মাপটা দেখিয়ে দিলে।

রাজপুত্র গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'তবু তো বড়ো!'

রাজকন্যা বললে, 'ওকে বড়ো বলে না।'

রাজপুত্র দুম ক'রে খাটে এক কিল মেরে বললে, 'বলে।'

—'আচ্ছা, বলে তো বলে!' রাজকন্যা এক ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলে। 'এবার সরো, বাবা এলেন, দেখে আসি।'

—'বাবা এলেন? তোমার বাবা?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, নয় তো কার বাবা আবার? শুনলে না, গাড়ির শব্দ হ'লো!' রাজকন্যা বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজপুত্র তার জামা টেনে ধরলো। বললে, 'দাঁড়াও, আগে আমি লুকিয়ে নিই!'

রাজকন্যা বললে, 'আঃ, কী আপদ। লুকোবে কেন তুমি? বই পড়ো না ব'সে ব'সে। ফ্যানটা খুলে নাও।'

রাজপুত্র বললে, 'না না তুমি জানো না, তুমি জানো না। আমাকে লুকোতে হয়। তুমি চট্ ক'রে ব'লে দাও তো শিবমন্দিরটা কোথায়?'

—'শিবমন্দির? শিবমন্দির কী হবে?'

—'বা, সেইখানে বেলপাতার গাদার ভেতরে আমি লুকোবো যে!'

—'সেকি! লুকোবে কেন?'

—'তাই নিয়ম। বেলপাতাগুলো বেশ টাটকা আছে তো? পচা পাতার গন্ধ আমি মোটে সইতে পারি নে!'

—'কিন্তু শিবমন্দির তো নেই!'

—'শিবমন্দির নেই মানে?'

—'নেই মানে নেই। মানে কি আবার?'

—'কিন্তু সে না-থেকেই যে পারে না। সব গল্পে থাকে, এখন তুমি নেই বললেই আমি শুনবো? তুমি চেনো না তাই বলো।'

—'বেশ তো মজা। আমাদের বাড়িতে, আর আমি চিনবো না। ছাড়ো ছাড়ো, বাবা ডাকছেন।'

বিপদ আসন্ন। রাজপুত্রের উত্তেজনায় রক্ত চ'ড়ে গেছে। জামাটা শক্ত করে ধ'রে রেখে বললে, 'চেনো তো বললেই পারো!'

—'আঃ, বলছি নেই!'

—'নেই অমনি বললেই হ'লো। তাহ'লে বললেই পারো তোমাদের রাজপুরীতে দিঘিও নেই, তাতে জল নেই, সেই জলের তলায়

স্ফটিকের স্তম্ভ নেই, সেই স্তম্ভের মধ্যে সোনার কৌটো নেই, কৌটোর মধ্যে ভ্রমর-ভ্রমরী নেই, তাদের মধ্যে রাক্ষসদের প্রাণ নেই—এসব কিছুই নেই, কেমন ? বলো না, বলো তাই।'

রাজকন্যা অবাক হ'য়ে বললে, 'তোমার কি মাথার অসুখ আছে? বলছো কী এসব পাগলের মতো?'

—'আজ্ঞে ঠিক কথাই বলছি। বলি পড়াশুনো কিছু কি করা হয় বাবুর? না ব'সে ব'সে খালি গেলাই হয় আর ফোলাই হয়?'

—'তার মানে?'

—'মানে আবার কী! "ঠাকুরমার ঝুলি"খানা পড়া হয়েছে একবারও?'

—'ঝুলি পরতে যাবো কেন? বা রে! কেন, আমার ফ্রক নেই?'

—'আঃ, সে-ঝুলি নয়, বই, বই।'

—'ও বাবা!' রাজকন্যার দু'চোখ গোল গোল হ'য়ে উঠল: 'বইয়ের নাম বুঝি ঝুলি!'

—'কেন, ঝুলি হ'লে দোষটা কিসের?' রাজপুত্র এবারে তেড়ে উঠলো—'বইয়ের নাম কাঠি হ'তে পারে, আর বইয়ের নাম ঝুলি হ'তে পারে না, না? বইয়েতেও গল্প থাকে, ঝুলিতেও গল্প থাকে। কাঠির সঙ্গে বইয়ের মিল কোনখানটাতে, তাই শুনি?'

—'যা-যাঃ, যত বাজে কথা!' ব'লে রাজকন্যা পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

—'বাজে কথা? ভূতের গল্প প'ড়ে প'ড়ে আস্ত একটা ভূত হ'য়ে গেছো আর-কি। এই নাও, ছাখো!'

ওভারকোটের পকেটে হাত পুরে রাজপুত্র ফস্ ক'রে তার 'ঠাকুরমার ঝুলি'খানা বার ক'রে ফেললে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার গায়ে ওভারকোট ছিল না। কিন্তু রাগের মাথায় কি আর সেসব কথা মনে থাকে? বইটা রাজকন্যার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'দেখুন! চেনেন? দেখেছেন কোনোদিন?'

রাজকন্যা বইটাকে উল্টেপাল্টে দেখলে। তারপর নাক সিঁটকে বললে, 'ছেঁড়া!'

রাজপুত্র সগর্বে বললে, 'ছেঁড়াই তো! ভালো বই-ই ছেঁড়া হয়। যে বই লোকে টানাটানি ক'রে একশোবার ক'রে পড়ে তাই-ই ছিঁড়ে যায়। চিরকাল চকচকে আস্ত থাকে তো সব বাজে বই, যা কেউ ছোঁয় না।'

—'ছাই জানো তুমি! "ঠাকুরমার ঝুলি" না হাতি, কোন্ ডাস্টবিন থেকে এক পচা ধ্যাৎলা বই কুড়িয়ে নিয়ে এসেছ!'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস ক'রে রাজকন্যার গালে এক চড়।

চড় মেরে রাজপুত্র বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, লেখাপড়া কিচ্ছু করিস নে তাই বল্! নইলে "ঠাকুরমার ঝুলি" চিনিস নে, তাকে বলিস পচা ধ্যাৎলা বই!'

আর যায় কোথা? হাঁউ মাউ খাঁউ ক'রে নখদন্ত খিঁচিয়ে একলাফে রাজকন্যা রাজপুত্রের ঘাড়ে। খিমচে, কামড়ে তাকে একেবারে অস্থির ক'রে দিলে।

রাজকন্যা নাদুস-নুদুস যেন হাতির বাচ্চাটি, আর রাজপুত্র জ্বোরো রুগী, পারবে কেন তার সঙ্গে? তায় রাজকন্যা সবলা হ'লেও নারীজাতি, রাজপুত্র তার গায়ে হাত তুলতে পারে না। সে খালি কোনো রকমে রাজকন্যার মার এড়িয়ে আত্মরক্ষা করছে। এরই মধ্যে লড়তে লড়তে এক সময় চেয়ে দেখে, সর্বনাশ! তার চোখের সামনেই রাজকন্যার মুখটা বদলে বদলে বীভৎস বিতিকিচ্ছি হচ্ছে—যেন রাক্ষসের মুখ।

তাই বলো, এটা রাজকন্যা নয়, রাক্ষুসী! বইয়েতে এরকম লেখা ছিলো না। কিন্তু এখন রাজকন্যাই যদি না থাকলো তবে কার জন্যে আর কষ্ট স'য়ে রাক্ষস মারা?

এক ধাক্কায় সে রাজকন্যা-রাক্ষুসীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে দৌড় মারলে।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। আগে আগে রাজপুত্র, পেছনে পেছনে রাজকন্যা রাক্ষুসী। ধুমসি হ'লে হবে কী, মেয়েটা ছুটতে পারে ঘোড়ার মতো। ওদিকে রাজপুত্রের পায়ের তলায় মাটি কেবলই স'রে স'রে যাচ্ছে, যতই প্রাণপণ দৌড়োয়, যেখানকার মানুষ সেইখানেই,—এক পা-ও সামনে এগোয় না। রাজকন্যা ওদিকে এসে পড়েছে, ধ'রে ফেলে আর-কি। বেগতিক দেখে রাজপুত্র শূন্যে লাফ মারলো। মেরেই দেখে, বাঃ, বেশ তো সে উড়তে পারছে। ছুটো হাত দিয়ে ডানার মতো ক'রে হাওয়া টেনে সে উড়ে এগিয়ে চললো—ঠিক যেন এঞ্জেল। রোগা রোগা হাতছুটোতে অবশ্য বেশি হাওয়া টানা যায় না; হাতছুটো পাখার মতো চ্যাপটা হ'লে ভালো হ'তো। কিন্তু যা নেই তা নেই, ছুঃখ ক'রে কী হবে?

অনেকক্ষণ রাজপুত্র উড়লো। তারপর তার হাত ক্রমে ভারি হ'য়ে এলো। উপায় নেই, মাটিতে থেমে দম নিতেই হবে। আস্তে আস্তে রাজপুত্র মাটির দিকে নামতে লাগলো। চেষ্টা করছে উপরে উঠতে, হাতের জোরেই কুলোয় না।

নামতে নামতে যেই তার পা মাটিতে ঠেকেছে অমনি পেছন থেকে রাজকন্যাও তার শার্ট খামছে ধরেছে। ধ'রেই তার ঘাড়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর চিমটি কেটে গর্জন ক'রে বললে, 'এইবার? এবার দিয়ে দিই ইঞ্জেকশন?'

ইঞ্জেকশনের নামে পেট-মোটা সেনাপতিমশাইয়েরও ভিরমি লাগে, রাজপুত্র তো ছেলেমানুষ। ভয়ে সে চোখ বুজলে। তারপরই ভাবলে, ছিঃ, একটা মেয়েকে দেখে ভয় পাচ্ছে!

রাজপুত্র চোখ খুললে। খুলে দেখলে, এর পরের পাতাগুলো সব একদম ছিঁড়ে গেছে।

ক্যামোফ্লেজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চাটুজ্জেদের রোয়াকে আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার ক'রে ফেলেছে। তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুলপি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতন মুখ ক'রে ক্যাবলা ব'সে আছে। হাতের শাল-পাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুলপির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, 'এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে?'

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না। শুধু মাথা নাড়লো।

—'খাবি না? তবে না-খাওয়াই ভালো। কুলপি খেয়ে ছেলে-পুলের পেটখারাপ করে'—বলতে-না-বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুলপিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, 'অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!'

—'অ্যাঁ অ্যাঁ! এর মানে কী? বলি, মানেটা কী হ'লো এর?'—টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেললে: 'আমার চার আনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাবো—একটা ভালো যুদ্ধের বই—'

—'যুদ্ধের বই!' টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, 'বলি, যুদ্ধের বই কী ছাইখার আছে র‍্যা? খালি ডুড়ুম ডুড়ুম, ধুম-ধাড়াক্কা। আর খানিকটা বাহাদুর-কা খেল্! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস তো শোন আমার কাছে।'

—'তুমি যুদ্ধের কী জানো?'—আমি ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—'কী বললি প্যালা?'—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে উঠলো: 'আমি জানিনে? তবে কে জানে শুনি? তুই?'

—'না, না, আমি আর জানবো কোত্থেকে?'—আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বাসক পাতার রস খাই আব পালাজ্বরে ভুগি—ওসব যুদ্ধ-ফুদ্ধ আমি জানবো কেমন ক'রে? তবে, বলছিলাম কিনা'—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে দিলাম।

—'কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনোই কিছু বলবি না।'—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রদ্দা কষিয়ে দিলে: 'ফের যদি যুদ্ধেব ব্যাপাব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হ'য়ে নাকের ডগায় এমন মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেবো যে সোজা বুদ্ধদেব হ'য়ে যাবি—বুঝলি? মানে, মিউজিয়ামে বুদ্ধদেব দেখেছিস তো? ঠিক সেইরকম!'

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট হ'য়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ছেড়ে বললে—

'আমি যখন যুদ্ধে যাই,—মানে বার্মা-ফ্রন্টে যেবার গেলাম—'

খুক-খুক ক'রে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল যেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

—'হাসছিস যে হাবলা?'—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পানসে মেরে গেলো। তোতলিয়ে বললে, 'ন্‌না, মা-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার যু-যু-যুদ্ধে গেলে—'

দারুণ উত্তেজনায় টেনিদা রোয়াকের সিমেন্টের উপর একটা কিল

বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ ক'রে উঠলো। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চিৎকার ক'রে বললে, 'গুরুজনের মুখে-মুখে তর্ক! ঐজন্যেই তো দেশ পরাধীন! বলি, আমি যুদ্ধে যাই না-যাই তাতে তোর কী? গল্প চাস তো শোন্, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চ'লে যা। তোদের মতো বিশ্ব-বখাটেকে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি!'

—'না না, তুমি ব'লে যাও। আর আমরা তর্ক করবো না।' হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করলো।

টেনিদা কুলপির শালপাতাটা শেষবার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'তবে শোন্—

'আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ি জায়গায় চলে গেছি। জাপানিদের পেলেই এমন ক'রে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা টুজিয়ামা' ব'লে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যাণ্ডার—তিন-তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়ে গেছি।'

ক্যাবলা ফস্ ক'রে জিজ্ঞেস করলে, 'সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায়?'

—'অতো খোঁজে তোর দরকার কী? বলি, গল্প শুনবি, না বাগড়া দিবি বল্ তো?'

—'যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা-ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা'—হাবুল মন্তব্য করলে।

—'যুদ্ধ করতে-করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—'

আমি বললাম, 'হাঁসের ডিম?'

টেনিদা বললে, 'তোর মাথা!'

ক্যাবলা বললে, 'তবে কি মুরগির ডিম?'

টেনিদা বললে, 'তোর মুণ্ডু!'

আমি আবার বললাম, 'তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম? তাও না? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক ঠিক, আমার যেন মনে পড়ছে। বোধহয় টিকটিকির ডিম—'

—'অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে!' টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠলো—'ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম!...হ্যাঁ—যা বলেছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানি পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে-খেতে জাপানি মারছি, ঝিমুতে-ঝিমুতে জাপানি মারছি, এমনকি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনও কোন-না দু-চারটে জাপানি মেরে ফেলেছি!'

—'নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানি মারা! সে আবার কী রকম?' —আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—'হেঁ-হেঁ-হেঁ—'টেনিদা একগাল হাসলো—'সে ভারি ইন্টারেস্টিং। আমার এই কুতুব মিনারের মতো নাকই দেখেছিস। এর ডাক তো কখনো শুনিস নি! একেবারে যাকে বলে, রণ-ডম্বরু। ঐজন্যেই তো মেজোকাকা ইঞ্জিনীয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউণ্ড-প্রুফ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওর আওয়াজ কারো কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনকে লেখালেখি করছিল কিনা! একদিন পুলিশ এসে বাড়ি তছনছ—রোজ রাত্রে এ-বাড়িতে মেশিন-গানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয় এখানে বে-আইনি অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! যাক, সে-গল্প আর-একদিন হবে।

'হ্যাঁ—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুতো যে আর সেন্ট্রির দরকার হ'তো না। জাপানিরা ভাবতো সারা রাত বুঝি মেশিন-গান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেতো না। আমাদের যিনি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার

ছিলেন—বোধহয় মিঃ বোগাস—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালো। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকতো আর আমার নাকে একটার পর একটা শিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারতো বসিয়ে দিতো। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই দোনলা বন্দুকের ছুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেতো—কত জাপানি যে ওতে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে তার হিসেব নেই।'

আমি বিড়বিড় ক'রে আওড়ালাম—'সব গাঁজা!'

টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরলো—'কী বললি?'

—'না না,—বলছিলাম, এই আর-কি'—আমি সামলে গেলাম: 'কী মজা!'

—'হ্যাঁ, সে খুব মজার ব্যাপার। ঐ জন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাই আমি'—টেনিদা তার দুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরলো।

—'তারপর? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধজয় হ'লো?'—হাবুল জানতে চাইলো।

—'অনেকটা। জাপানিদের যখন প্রায় নিকেশ ক'রে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হ'য়ে গেলো। আর সেইটেই হ'লো আজকের আসল গল্প।'

—'বলো, বলো',—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানলাম।

টেনিদা আবার শুরু করলো: 'আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলা দেশের ঘিয়ে-ভাজা নেড়ি কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউণ্ড। যেমন তার গাঁক-গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর, কী তালিম ছিল তার! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু-পায়ে খাড়া হ'য়ে হাঁটতে পারতো। বেচারা অপঘাতে মারা গেলো। দুঃখ কুকুরটার জন্যে, তবে, বামুনের জন্যে মরেছে—ব্যাটা নির্ঘাত স্বর্গে যাবে।'

—'কী ক'রে মরলো?'—হাবুল প্রশ্ন করলো।

—'আরে দাঁড়া না কাঁচকলা! যত-সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে দিচ্ছে!

—'যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোনো কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ি জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দু'দিন আগেই জাপানি ব্যাটারা ওখান থেকে স'রে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পেছনে পেছনে।

'কিন্তু ঐ বেঁটে ব্যাটাদের পেটে-পেটে শয়তানি! দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে! যেতে-যেতে দেখি, পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যতো না পাতা, তার চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া! দেখলে নোলা শক্‌শক্‌ ক'রে উঠে।'

—'আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া!' আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ ক'রে ফেললাম।

—'ত্থাখ্‌ প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস তো একটা চাঁটি হাঁকিয়ে'—

'আহা যেতে দাও—যেতে দাও'—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, 'পোলাপান!'

—'পোলাপান!'—টেনিদা গর্জে উঠলো : আবার বকর-বকর করলে একেবারে জলপান ক'রে খেয়ে ফেলবো—এই ব'লে দিলাম, হুঁঃ!'

—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাসা কাশীর ল্যাংড়া! কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত ক'রে বললে, "গোটাকয়েক আম পাড়ো!" '

ক্যাবলা বললে, 'কুকুরটা আম চাইলো?'

—'চাইলোই তো। এ তো আর তোদের এঁটুলি-কাটা নেড়ি নয়, সেরেফ বিলিতি গ্রে-হাউণ্ড। আম তো আম, কলা, মুলো, গাজর, উচ্ছে, নালতে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবৎ ক'রে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা'—টেনিদা থামলো।

—'কী হ'লো?'

—'যা হ'লো তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানি ভাষায় 'ফুজিয়ামা টুজিয়ামা' ব'লে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক মার্চ। তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে 'নিপ্পন বানজাই' ব'লে হাঁটা আরম্ভ করলে।'

'সেকি!' আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম: 'গাছটা তোমাকে ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলে!'

'করলে তো! আরে, গাছ কোথায়! স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।'

—'ক্যামোফ্লেজ! তার মানে?'

—'ক্যামোফ্লেজ মানে জানিসনে? কোথাকার গড়োল সব!' টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি ক'রে বললে, 'মানে ছদ্মবেশে। জাপানিরা ঐ ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনো গাছ সেজে, কখনো ঢিপি সেজে ব্যাটারা ব'সে থাকতো। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস!'

'—সর্বনাশ! তারপর?'

—'তারপর?' টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলো: 'তারপর যা হওয়ার তাই হ'য়ে গেলো।'

—'কী হ'লো'—আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'কী করলে তারপর?'

'আমাকে ধ'রে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেলো। ক্যামোফ্লেজটা খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে-দাঁত বের ক'রে পৈশাচিক হাসি হাসলো। কোমর থেকে ঝকঝকে একটা তরোয়াল বের ক'রে বললে, 'মিস্টার, উই উইল কাট ইউ!'

—'কী ভয়ানক!'—ক্যাবলা আর্তনাদ ক'রে বললে, 'তুমি বাঁচলে কী ক'রে?'

—'আর কি বাঁচা যায়!' বললে, "নিপ্পন বান্‌জাই"—মানে, জাপানের জয় হোক!" তারপর তরোয়ালটা উপরে তুলে—'

হাবুল অস্ফুট স্বরে বললে, 'তরোয়ালটা তুলে?'

'ঝাঁ ক'রে এক কোপ! সঙ্গে-সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেলো। তারপর রক্তে রক্তময়!'

—'ওরে বাবা !'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম: 'তবে তুমি কি তাহ'লে—'

—'ভূত? দূর গাধা। ভূত হ'লে কারু কি ছায়া পড়ে? আমি জলজ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়ছে—দেখতে পাচ্ছিস না?'

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারলো: 'মুণ্ডু কাটা গেলো, তাহ'লে তুমি বেঁচে রইলে কী ক'রে?'

—'হুঁ হুঁ। আন্দাজ কর দেখি!'—টেনিদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগলো।

—'কিছু বুঝতে পারছি না'—কোনোমতে বলতে পারলাম আমি। মনে মনে ততক্ষণে রামনাম জপ শুরু করেছি। টেনিদা ব'লে ভুল ক'রে তাহ'লে কি এতোকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি!'

—'দূর গাধা!' টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, 'কুকুরটা পালিয়ে এলো যে!'

—'তাতে কী হ'লো?'

—'তবু বুঝলি না? আরে, এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ।'

—'ক্যামোফ্লেজ!'

—'আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুঁটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই! মানে, আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে অমন পাঁচশো জাপানিকে কিনতে পারি। মানে, আমি কুকুর সেজেছিলাম আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানি জানতাম তো? ওরা যখন আমার—মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে ল্যাজ তুলে আমি হাওয়া!

—'আর তার পরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রসটা।'

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার: 'দু'আনা পয়সা বার কর প্যালা, ঐ গরম চানাচুর যাচ্ছে—'

ভালো জিনিশটা খেতে সবাই ভালোবাসে। আমরাও ভালোবাসি, আপনিও ভালোবাসেন, কিন্তু পিসির শখের পোষা ছাগল পঞ্চাননীর এসব ভালো লাগা একটু বেশি রকমের ছিল। পিসি তাকে সব সময়ে সদুপদেশ দিতেন : ছ্যাখ বাছা, রসনা সংযত কর। নইলে জীবনে তোর অশেষ কষ্ট হবে। লোকে বলে লোভে পাপ—'

পঞ্চাননী শুধু দাড়ি নেড়ে জবাব দেয়—'ভ্যা—এ-এ।'

পিসি বললে,—'ভ্যা বই কি! আসুক ভুতো, তোর দাড়ি ছিঁড়ে দিয়ে খোঁপা বেঁধে দেবে।'

পঞ্চাননী হঠাৎ সামনের দিকে বেগে ছুটে এলো শিং নেড়ে—

'কি রে, গুঁতোবি নাকি? আমার খাবি পরবি আর আমায়ই গুঁতোবি! দাঁড়া তোকে খাবার ব্যবস্থা করছি ভুতোকে ব'লে!'

—'কী পিসি?' হাতে একটা তিলের নাড়ু কটর-কটর করে কামড়াতে-কামড়াতে ভুতোর আবির্ভাব হ'লো : 'আমার ডাকছিলে পিসি?'

'ডাকবো না? তুই বলিস কী রে—মানুষ ছাগল খায় জানি, কিন্তু ছাগলে যে মানুষ খেতে চায়! অমন আপদও পুষেছি!'

ভুতোর হাতের কনুই বেয়ে তিলের নাড়ুর রস নামছিল। তাইতে একটা চাটা দিয়ে হাতের দিকে উদাস দৃষ্টি ফেলে পঞ্চননী ডাকলে, 'ভ্যা—এ-এ!' অর্থাৎ, কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য জিনিশ দেখলাম!' এটা তার বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

—'তবে রে! আজ তোকে জবাই করবো, দাঁড়া!'—কিন্তু ছাগলটা ভবিষ্যৎ-দর্শী। নিমেষেই সে ভুতোর আওতার বাইরে একেবারে আঁস্তাকুড়ের ছাইয়ের গাদায় নেপোলিয়ানের মতো ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়ালো।

—'ওরে ভুতো, ও আঁস্তাকুড়ে যাসনি এ শীতের রাতে, নাইতে হবে!' পিসিমা ভুতোর জামা চেপে ধরলেন।

এটা ভুতোর কারফিউ এরিয়া বুঝতে পেরে পঞ্চাননী লেডিস্ জুতোর মতো আওয়াজ তুলে ছাইয়ের গাদায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পিসিমা দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে বললে : 'মরণ-দশা!'

সকালে উঠে পঞ্চাননীর একটু চা খাওয়া অভ্যেস। বেরোবার সময় বিন্দের মা মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিলো, 'পিসি, ওকে ছাগল ব'লে তুচ্ছ ক'রো না। ও শাপভ্রষ্ট দেবতা। ওর যা বুদ্ধি, দেখলে অবাক হতে হয়। তা, দোষের মধ্যে এই একটু চা খাওয়া। তা, দিলেই বা! তবে চিনি দুধ একটু বেশি খায়। সবার মুখের তার তো সমান নয়! একটু ক্ষমা-ঘেন্না করতেই হবে, অবোলা জীব ব'লে।'

পিসি যেন কেমন ভড়কে গিয়েছিল; শুধু ভুতো বলেছিলো : 'হুম্!'

আজ পঞ্চাননীর দেহটা ভালো নেই। কেমন মাথাটা ধরা-ধরা ভাব লেগেছে। গয়লা দুধ দেয়নি, তাই চা খেতেও দেরি হ'য়ে গেছে। এরা চায়ের গুরুত্ব বোঝে না। চা নয়, যেন ওষুধ তৈরি ক'রে পিসি একটা মালায় ক'রে খানিকটা চা পঞ্চাননীর সামনে দিয়ে বারান্দায় ভুতোর জন্য একটা কাপ রেখে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। পঞ্চাননী নিজের চায়ের মালায় মুখ দিয়ে দেখলে, তাতে দুধ চিনির পরিমাণ কম। ভুতো ঘুড়ির কানি বেলের আঠায় জুড়ছিল। এতে তার অখণ্ড মনোযোগ। পঞ্চাননী টিপি-টিপি পায়ে এসে কাপে মুখ দিলে : বাঃ, এর তো খাসা স্বাদ!—এই তো চাই!'

'পিসি চা দিলে না—ও পিসি—'

'ভ্যা—!'—উত্তর এলো পিছন থেকে।

'তবে রে ছাগল! তোর দফা আজ ঠাণ্ডা করছি!' বেলটা তুলে নিয়ে ভুতো ছুটলো—'পঞ্চাননী ছাগলের নিকুচি করেছে! কতবার বললাম, ওটাকে কেটে খাও। না, বলে বেচবো। এখন গায়ে গোবরের গন্ধ, ওকে কে কিনবে? বেচাও যাবে না, ঘরে বসে খেয়ে-খেয়ে পাগল করে তুললে! আপদ!'

কিন্তু গোলমাল বাধলো সকালে। পিসি কেবল আহ্নিক করতে বসবেন, বাড়ি লোকে লোকারণ্য। একদল লোকের

চক্রব্যূহের মধ্যে পঞ্চাননী যেন চোরের মতো ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছে।

'কী হ'লো রে—বাড়িতে যে ডাকাত পড়েছে।'

'এতোদিন পড়েনি পিসি, এবার সত্যিই পড়লো—'ও-পাড়ার ভজা চিৎকার করে ভাঙা গলায় বললে—'এই দেখুন, আপনার পুষ্যিপুত্তুর। এটা একেবারেই ছাগল।'—ভজা একটা ছেঁড়া মোজা দিয়ে ওর গলাটা বেঁধে ধরে রেখেছে। পঞ্চাননী যেন হাঁড়িকাঠে পড়ার মতো ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাইছে।

'ওকে আজ কেটেই ফেলবো!'—ক্রুদ্ধ ভজার গলার আওয়াজ আবার শোনা গেলো।

'তাই ফ্যালো,'—ভুতো সুচিন্তিত মতামত জানালো।

'জানিস তোদের ছাগল কী করেছে?'

'না, জানি না।'—গম্ভীরভাবে ভুতো বললে।

'কাল রাতে ও পিসেমশায়ের বৈঠকখানার চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপরে এক ডিবে নস্যি ছিল তা খেয়েছে, জমি-বিক্রির দলিল খেয়েছে। টেবিলের উপরের অয়েল-ক্লথ সজনে-ডাঁটার মতো চিবিয়েছে; কালির দোয়াত খেয়েছে; এক বাটি পুরোনো ঘি—'

'ওরে, ওকে তোরা মেরে ফ্যাল!—' পিসি আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

'ওকে মারতাম, কেটেই খেতাম—কিন্তু ওর গায়ে ভারি গন্ধ!' ভজা যেন কেমন ভড়কে গিয়ে বলে ফেললে।

'আর গন্ধ! ও এবার পচে পচে মরবে, এতো পুরোনো ঘি কি ওর পেটে সইবে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননী ধপাস ক'রে শুয়ে পড়লো শিবচক্ষু ক'রে। সঙ্গে-সঙ্গে মোজার টানে ভজাও ধরাশায়ী।

'ওরে পঞ্চাননী বুঝি মরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আমার পঞ্চাননী গেলো—'

'কোথায় গেলো—কোথায় গেলো'—ভুতো প্রাণপণে একটানা চেঁচিয়ে চললো।

উঠোনে দাঁড়িয়ে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো : ব্যাপার কী ?

'খুন—খুন—' ভুতো হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করলো। আধঘণ্টা পরে পিসি যখন চেঁচিয়ে হয়রান হয়েছে, তখন চেয়ে দেখে বাড়ি খালি, শুধু দখিনা হাওয়ায় পঞ্চাননীর দাড়ি ফুর-ফুর ক'রে উড়ছে।

পরদিন সকালেও পঞ্চাননী উঠলো না। পিসি বললে, 'আহা, না উঠলো! কেষ্টোর জীব ; ঘুমোক বরং। পেট ওর বড্ড ফেঁপেছে, যেন ফাঁসির খাওয়া খেয়েছে গো—'

'ভাখো পিসি, মেলা বোকো না। রাতে ওকে পুরো একশিশি জোয়ানের আরক খাইয়েছি, তাতেও কোন আপত্তি করলে না। ওর হ'লো কী ?'

'কী করি বাছা! ও যদি অমন না খেয়ে-দেয়ে প'ড়ে থাকে, ওকে কোবরেজ মশায়ের কাছে বেচে দে—। মহামাস তেল বানাক, তখন বুঝবে ঠ্যালা কাকে বলে—'

এবার কিন্তু পঞ্চাননী কান নাড়লো।

'দেখলি, ওর হাড়ে-হাড়ে ভেল্কি খেলে! ও সব জানে, সব বোঝে —শুধু খাজনা দেবার ভয়ে কথা বলে না।'

পিসিমা স্নান সেরে পুজোয় বসেছেন। সামনে ধূপ-ধুনো, ফলমূল। গঙ্গামাটিতে গড়া শিবকে পুজো ক'রে, গভীর ধ্যান সেরে স্তব পাঠ, তাও আধঘণ্টা।

হঠাৎ চোখ খুলে চমকে উঠলো পিসি। ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, মায় গঙ্গামাটির শিবঠাকুর পর্যন্ত খেয়ে টাটের ওপর সম্বুদ্ধ হয়ে ব'সে ব'সে জিব চাটছে পঞ্চাননী।

চোখ খুলেই পিসি চোখ বুজোলে : 'ওরে ভুতো! এটাকে বস্তায় পুরে একটা টিকিট ক'রে হাওড়ার গাড়িতে তুলে দে বাবা! আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না!'

পঞ্চাননী লেডিস্ জুতোর মতো শব্দ তুলে পিসির সামনে এসে বললে, 'ভ্যা—'অর্থাৎ তার পিসির মুখ দেখতে কোন বাধা নেই তো।

ভুতো বললে, 'চল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!' হাতের আধখানা-খাওয়া কৎবেলের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে পঞ্চাননীর গলা জড়িয়ে টেনে ধরলো। কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর সে নড়লো না, পালালো না বা আপত্তি করলো না। তার সমস্ত হৃদয় যেন অনুশোচনায় মথিত হয়ে উঠেছে।

'চল্ বলছি! তোর ঘাড় যাবে!'

পঞ্চাননী ছাগল হ'লেও পাগল নয়। সে ঘাড় ফেরালো। পিসি চেঁচিয়ে বললে, 'যাবি না, বাঁদর কোথাকার! তোকে যেতেই হবে! তোকে পাঠিয়ে তবে আমি জল গ্রহণ করবো।'

পঞ্চাননী বললে—'ভ্যা—এ—এ—'

'তোকে ভেউ করাচ্ছি!' হাতের কাছে ছিলো একটা হাতা, ভুতো তুলে নিলো।

এবার পঞ্চাননী আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার অন্তর উদাস হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ উঠোনের উপর প'ড়ে মূর্ছা গেল। মনটা অত্যন্ত নরম ছিল কিনা!

গভীর রাত। পঞ্চাননী বারান্দায় শায়িত। পিসি একটা বস্তা চাপা দিয়ে শুতে গেছে। চারিদিকে গভীর অন্ধকারে শব্দ হ'লো, খুট!

একটা ধেড়ে ইঁদুর পঞ্চাননীর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেলো।

একটা ছুঁচো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ছুঁচোলো মুখ ক'রে খানিকটা বিশ্রী গন্ধ পঞ্চাননীর গায়ে ছেড়ে দিলে। পঞ্চাননী মুখ ফেরালো।

খুট—খুটুস—

আবার শব্দ। পঞ্চাননীর ভারি বিরক্ত লাগছিল। একটু ঘুমুতেও দেবে না এরা! পঞ্চাননী এবার কান নাড়লো।

আস্তে আস্তে একটা কালো ছায়া এগিয়ে আসছে। আসছে ধীরে,

অতি ধীরে। আস্তে আস্তে সে বারান্দায় উঠলো পঞ্চাননীর ল্যাজের উপর দিয়ে; সে দরজার কাছে এগুতেই দাড়িতে বিরাট পদক্ষেপ।

আর যায় কোথায়! পঞ্চাননীর রক্ত গরম হয়ে গেলো। ছাগল হলে কী হয়, ওর কি মানসম্মান সব গেছে? মাথার শিং ছুটোকে বেশ খাড়া ক'রে নিয়ে টিপি-টিপি পায়ে এগিয়ে এসে ছায়ার পিছনে এক গুঁতো—যাকে বলে সজোরে, অর্থাৎ বিরাশি শিক্কায়!

'ওরে বাবা রে মেরে ফেললে রে!' ধপ-ধপাস ধাঁই! ছায়ার পতন ও মূর্ছা।

পঞ্চাননী বললে,—'ভুর্—র্—ভ্যা—' অর্থাৎ ঠিক হয়েছে।

'ওরে ও ভুতো, ওঠ, শিগগির ওঠ! বাড়িতে চোর এসেছে! উঠে পড়!'

গোঁ—গোঁ শব্দে ঘুমের চোখে ভুতো বেরিয়ে এসে পিসির হাতে ধরা লণ্ঠনে দেখে, ও মা, উঠোনে পতিত চোর, আর শিকারের কাছে রাগে কেশরের মতো দাড়িগুলো ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সিংহের মতো পঞ্চাননী।

পিসিই সর্বাগ্রে ঘোষণা করলেন, 'ওরে তোরা দেখে যা, আমার পঞ্চাননী চোর ধরেছে!'

বাড়ি লোকে লোকারণ্য! হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! ভুতো পঞ্চাননীকে জড়িয়ে ধরতেই আবেগে পঞ্চাননী ভুতোর নাকে বসিয়ে দিলে এক গুঁতো।

পিসি পিঠে হাত দিয়ে বললে, 'ছিঃ বাবা, ও তোমার দাদা, ওকে গুঁতোতে নেই! পাপ হয়!' পঞ্চাননী এবার পিসির দিকে লক্ষ্য স্থির করতেই পিসি বললে, 'আমি তোমার পিসি, গুরুজন! অনেক অন্যায় করেছি বাবা, এবার সব ভুলে যাও।'

বিনয়ে জগৎ বশ হয়, পঞ্চাননী তো কোন ছার! পিসির মুখের দিকে রসগোল্লার মতো চোখ তুলে বললে,—'ভু—র্—ভ্যা'—অর্থাৎ, সন্ধি!

প্রত্যুপকার

কার্তিক মজুমদার

হাতিকে কেউ কখনো চিনতে পেরেছে আজ পর্যন্ত ? কেউ পারেনি। কেউ বলেছে হাতি অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী, আবার কেউ বলেছে হাতি বেজায় লাজুক। কেউ বলেছে হাতি যেমন দাম্ভিক তেমনি নির্লজ্জ, আবার কেউ বলেছে হাতি বেজায় মুখচোরা, সত্যি কথা মনে এলেও ওর মুখে আসে না। কেউ বলেছে হাতি বেজায় বুদ্ধিমান, পশুদের মধ্যে পণ্ডিত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমার মনে হয় কেউই হাতিকে চিনতে পারেনি। এরা কেন, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জানেন না হাতিকে ভালো ক'রে। তাই তো হাতি নিয়ে এতো বিভিন্ন মতবাদ। হাতি নিয়ে কেউ কোনো দিন ঘর করিনি, হস্তিমুর্খ নিয়ে অবশ্য করেছি, তাই হাতির মতিগতি কী, চট ক'রে বলতে আমিও অক্ষম। তবে হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি, হাতি কখনো বেইমান হয় না। উপকার করলে তার প্রতিদান দেবেই। মানুষ হয়ে যে আমি এইটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছি, এই যথেষ্ট।

যাক ও-সব বাজে কথা। আমার জীবনে একবার হাতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তারই গল্প বলি শোনো।

তখন আসামের জঙ্গলে জরিপের কাজে আমি ব্যস্ত। একদিন সকাল ন'টায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে দাঁতন করছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মেহের আলী ঘরে এসে ডাকল, 'হুজুর!'

'হুজুর' ডাক শুনে তোমার হাসছ, কিন্তু সত্যি কথা। অবশ্য এর জন্যে ওকে প্রায়ই বকশিস দিতে হ'তো। মেহের আলীর কাছে আমি

হুজুর, আর বিল সাহেবের কাছে আমি 'ডাস্'। শুধু দাস না, ভাবখান এমন করি, যেন আমি কতই দাসানুদাস। একেই বলে আপেক্ষিক গুরুত্ব।

সকালবেলায় হঠাৎ হুজুরের তলব পড়লো কেন? ভ্রূ কুঁচকে বিছানাটায় অনেক কষ্টে উঠে বসতে হ'লো। মেহের আলী ততক্ষণে হন্তদন্ত হয়ে শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে সে নিবেদন করলো, 'হুজুর, হাতি, হাতি!'

'হাতি?' আমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম, বললাম, 'হাতি আমি ঢের দেখেছি।'

'না হুজুর,' মেহের আলী দমে না—'দূরে নেই হুজুর, কাছে কাছে, একদম তাম্বুকা বগল!'

তাম্বুকা বগল, বলে কী! ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলি, 'রাহা সাহেবকে খবর দিয়েছিস? দিসনি এখনো? কখন এসেছে? কশো? করছে কী?'

এইবার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। জানলা দিয়ে একবার রাহা সাহেবের তাঁবুর দিকে তাকালাম। দুটো বন্দুক আছে নৃপেন রাহার, যদি কিছু সুরাহা হয়।

উত্তরে মেহের আলী বললে, 'কুছু ডর নেই হুজুর, একদম বাচ্চা হাতি, হাতিকা লেড়কা-উড়কা হবে। বাইরে চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে, আউর বহুৎ খুন নিকলাচ্ছে পা দিয়ে।'

বললাম, 'আমায় কী করতে হবে শুনি?'

ও বিনীতভাবে নিবেদন করল, 'কুছু দাওয়াই।'

'দাওয়াই! হাতির গায়ে হাত দোব কী ক'রে?'

'একদম বাচ্চা হুজুর, কুছ ডর নেহি,' মেহের আলীর আবেদন এবার নিবেদনে এসে পৌঁছয়।

কী আর করি, মেহের আলীর হাতে ফার্স্ট-এডের বাক্সটা দিয়ে গুটি-গুটি এগোলাম। বেরিয়ে এসে দেখি, সত্যিই একটা হাতির বাচ্চা তিন পায়ে ভর দিয়ে এক পা তুলে ব'সে আছে, বেশ করুণ করুণ মুখ ক'রেই।

প্রাথমিক চিকিৎসায় দুএকটা টুকিটাকি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ভাষার

অভাবে আমতা আমতা করছিলাম। কিন্তু দেখলাম, মেহের আলী কাজের লোক, এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ব'সে আছে। বললে, 'দেখুন হুজুর, এর পায়ে একটা পেরেক ফুটেছে।' চেয়ে দেখলাম, সত্যিই তো, পায়ের নিচ দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

ভয়ে ভয়ে একটা চোখ হাতির উপরে রেখে আস্তে আস্তে অপারেশনের বাক্সটা খুললাম। মেহের আলী পিছন থেকে উৎসাহ দিলে, 'দেখুন হুজুর, কপালে কেমন শাদা দাগ, একদম রাজহস্তী আছে হুজুর।' ভাবখানা, আমিও সেইসঙ্গে রাজবৈদ্য ব'নে গেছি।

রাজবৈদ্যই ব'নে গিয়েছিলাম, নইলে জীবনে যা হয় না, তাই হ'লো। একবার একটু কেটে একটু টান দিতেই রোগের বীজ বেরিয়ে পড়লো—প্রায় বিঘৎ-খানেক লম্বা এক পেরেক। অভাবিত সাফল্যের উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে একটা আর্তনাদ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলাম। কারণ হাতির বাচ্চাটাও একটা আনন্দের হুঙ্কার দিয়েছে, আর তা আমার কানের কাছেই।

একটানা ঊর্ধ্বশ্বাসে কতদূর দৌড়োতাম কে জানে, মেহের আলীই আমাকে থামালে, বললে, 'এবার থামুন হুজুর, এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দেখুন ও কী করে।' দাঁড়িয়ে দেখবো কী, তখন আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। কী খুনের পাল্লায় পড়েছিলাম রে বাবা, একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।

রাজহস্তী-তনয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে ততক্ষণে বৃংহন ছাড়তে শুরু করেছে। একবার বোধহয় আমার খোঁজ করলো। তাঁবুটার মধ্যে শুঁড় গলিয়ে একবার বোধহয় আমাকে খুঁজলো, পরমুহূর্তে তাঁবুটাকে ভূমিসাৎ করলে। সামনের টেবিলটাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেললে, তারপর কি ভেবে গজেন্দ্রগমনে বনের পথে হাঁটা দিলে।

এবার আমি একটা নিশ্বাস নিলাম, তারপরেই মেহের আলীর দিকে চোখ পাকিয়ে চাইলাম।

সে আগেই চোখ পাকিয়েছিল, আমার দিকে অবশ্য নয়। বললে, 'দেখিয়ে হুজুর কেইসা বেইমান হ্যায়।'

আমার তখনও গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। উপকার করতে গিয়ে নিজের প্রাণ খোয়াচ্ছিলাম! এইসব জানোয়ারদের পেটে এক, মুখে আর। 'বেইমানই বটে!

কিন্তু সেদিন আমি ভুল বুঝেছিলাম।

এর পাঁচ ছ-বছর পরের কথা। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা জনারণ্য। সমস্ত সিনেমা আর থিয়েটারে ঢুঁ মেরে মেরে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হ'য়ে একটা সার্কাস কোম্পানির গেটে লাইন লাগালাম। প্রচণ্ড ভিড়। সামনের লোকের কনুই-এর ধাক্কা খেতে খেতে হঠাৎ নিজেকে টিকিট-ঘরের কাছে আবিষ্কার ক'রে ফেললাম এবং একটা টিকিটও মিলে গেলো। দিনের আলোতেও কী না হতে পারে আজকাল কলকাতায়!

এরপরে আবার যখন ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ার অধিকার ক'রে বসলাম, তখন আমার প্রায় তুরীয় অবস্থা। আবাম ক'রে চোখদুটো আধখানা মেলে দিয়ে ক্লাউনদের হৈ-হুল্লোড় দেখতে শুরু করলাম। বাস্তবিক, জমিয়েছে বেশ এরা! টিকিট কেনাটা সার্থক হয়েছে আমার।

ক্লাউনদের হল্লা শেষ হতে স্টেজে ঢুকলো কয়েকজন পশুরাজ। রাজচক্রবর্তীর কোনো চিহ্ন নেই তাদের—বোধহয় সামন্ত-রাজই হবে। কারণ, বেশ শান্ত সুস্থ ভাব দেহের গতিতে। তারা কয়েকবার বল লোফালুফি করলে, লাফ-টাফের কায়দা দেখালে, তারপর ধীরেসুস্থে যে যার স্থানে ফিরে গেল।

ম্যানেজার এসে জানালেন, এবার হাতিদের বাইসাইকেল রেস হবে।

বাইসাইকেল চালাবে হাতি! নিজেরই যে-বিদ্যে ভাল করে আয়ত্ত নেই, তাই কিনা—! আমি সন্দেহ জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ম্যানেজারবাবু তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটা সাইকেল এনে সামনে রাখলেন। আর সেইসঙ্গে ধীর পদক্ষেপে এক পা এক পা ক'রে চারটে হাতি গম্ভীর ভাবে এগিয়ে এল।

ক'ষে হাততালি দিচ্ছিলাম, কিন্তু চার নম্বর হাতিটা সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার যেন হাতে হাত লেগে গেল। হাতিটার ভাবভঙ্গী মোটেই সুবিধের নয়। কেমন ক'রে যেন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে পাগল কি আমি পাগল, ভাবার আগেই হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে। সভয়ে দেখলাম, হাতিটার কপালে শ্বেত রাজচিহ্ন চকচক করছে।

এক মুহূর্তে হিম-হয়ে-যাওয়া শরীরে আমি সমস্ত কিছু বুঝতে পারলাম। সেই হাতি, যেটাকে বাচ্চাকালে হাতুড়ে বিদ্যায় বাঁচিয়েছিলাম। কপালের সাদা চিহ্ন,চলবার ভঙ্গি,সবকিছু অবিকল ঠিক আছে।

দ্বিতীয়বার হাতিটা আমার দিকে পরিচিতের মতো তাকিয়ে একবার বৃংহন ধ্বনি করলো, তারপর এগিয়ে এলো।

সমস্ত শরীরের রক্ত ততক্ষণে আমার বরফ হ'য়ে গেছে। মনে হ'লো, কেন এসেছিলাম, কেন এসেছিলাম? পেরেক নাহয় ভুলে দিয়েছি, কিন্তু অন্তরের ব্যথা কি ভুলেছে? সেদিন আমাকে নাগালে পায় নি, আজকে পেয়ে কি ছাড়বে? একে স্মরণশক্তি, তারপর মেহের আলীর কথামতো যদি সত্যিই রাজহস্তী হয়, তো রাজরোষের হাত থেকে আজ আর রেহাই নেই।

পালাবার পথ নেই, ডাইনে বাঁয়ে চেয়াবের অরণ্য; রোদন ছাড়া আর উপায় নেই। তারই বা সময় কই?

হঠাৎ তৃতীয় বৃংহন দিয়ে সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে হাতিটা শুঁড় বের ক'রে স্টেজ থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এলো। তারপর আমাকে শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে লুফে নিলে। মনে হ'লো, আর এক সেকেণ্ড পরেই এ শরীর ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু হাতিটা তা করলে না। কী করলে জানো? শুঁড়ে জড়িয়ে আমাকে সেই ছারপোকাওয়ালা বেতের চেয়ার থেকে তুলে নিলে, তারপর ওধারের ফ্যানের নিচের পনেরো টাকার গদিওলা সীটের উপর সযত্নে বসিয়ে দিলে।